— দু টাকা বারো আনা —

মিত্রালয় :: ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি, ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
বি. জি. প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ৮০।৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীকানাইলাল দে কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীমতী ছায়া দেবী

সোদরপ্রতিমাসু

আমার-পোষাক কামরা। পাঁচটা কাপড়ের আলমারী, জুতো বোঝাই সেল্‌ফ্, ড্রেসিং-টেবিলে লেশ-বাসনো টেবিল-ক্লথের ওপর শিশি, বোতল, কৌটো, চিরুনি, ব্রাস কায়দা মাফিক্ সাজান। আমার নিজস্ব ভৃত্যটি এই সব পোষাক পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধান করতে করতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়।

পাশের বাথরুমে ধারা ও অবগাহন দু'রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে। বাথরুমটির আধুনিকতম সাজসজ্জা। আমার গায়ে দামী সাবান ও সেণ্টের সুগন্ধ।

এখনও সন্ধ্যা হতে দেরী আছে, এইবার রাত্রের আহার সমাধা করে টাইয়ের সঙ্গে ম্যাচ্ করে জুতো জামা পরে সাহেব পাড়ায় থিয়েটার দেখতে যাব, ফিরে এসে এক পেয়ালা হর্লিক্‌স্। থিয়েটার রোজই দেখি না, কিন্তু খাওয়া সন্ধ্যার মধ্যে রোজই সারা হয়ে যায়।

ফিরে এসে প্রিয় লেখকের নতুন নভেলখানি নিয়ে বিছানায় শোব, যদিও এম-এ পরীক্ষা আসন্ন কিন্তু পড়ার বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক খুব বেশী রাখি না। অভিভাবকদের বিশ্বাস—একটু মনোযোগী হলে না জানি কি করে ফেলতাম।

গৃহশিক্ষকদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার সুযোগ না থাকায় প্রবেশিকায় প্রথম স্থান অধিকার করি। তারপর আই এ-তে পঞ্চম ও বি-এ অনার্সে দ্বিতীয় হই। সঙ্গের যে ছেলেটি প্রথম হয়েছিল, সেই অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের ওপর বাবা রীতিমত চটে গিয়েছিলেন।

সংসার নারী-বর্জ্জিত হওয়ায় বাপ ঠাকুরদা দুজনেরই আমার সুখ সুবিধার দিকে সতর্ক দৃষ্টি। ওঁরা নিজের নিজের ফুলশয্যার খাটে

শুয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন স্থির করে রেখেছেন, আমার ব্যবস্থা আলাদা। আমার ঘরের আসবাব-পত্র মাঝে মাঝে বাড়ী থেকে চলে গিয়ে সিকি দামে বিক্রি হয়, চড়াদামের নতুন জিনিষ এসে তাদের স্থান পূর্ণ করে।

কলকাতার পক্ষে যথাসম্ভব বড় বাগানের মধ্যে আমাদের দক্ষিণ-দুয়ারী নতুন তিনতলা বাড়ী। গাড়ীবারান্দার কোলে চওড়া বারান্দা, দুপাশে দুটি, মধ্যে একটি—মোট তিনটি বড় বড় ঘর। পুবের ঘরটি বাবার বৈঠকখানা। মাঝের ঘরজোড়া তক্তাপোষে ফরাস পাতা, ফরাসের চাদর, তাকিয়ার ওয়াড় বকের পালকের মত ধব্‌ধবে শাদা। পশ্চিমে লাইব্রেরী, বইয়ের আলমারীগুলিতে তালা ঝোলান, চাবি মধু ভাঁড়াড়ির কাছে। লাইব্রেরীর এক কোণে সতরঞ্চপাতা ছোট তক্তাপোষ। গরীব গোছের কোনও ভদ্রলোক কার্য্য উপলক্ষ্যে দেখা করতে এলে তাঁকে এইখানে বসান হয়।

পশ্চিমের ঘর, আগত ভদ্রলোক ঘণ্টাখানেক ঘামেন, কারণ এই ঘরে পাখা রাখা হয় নি। তারপর তিনি যাকে চান তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বাবার সঙ্গে দরকার থাকলে ওরই মধ্যে নিকৃষ্ট ধরণের আসনে বসতে সক্ষম হন, ঠাকুরদার কাছে তাঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শেষ করতে হয়।

উত্তর দিকের বারান্দার কোলে সিঁড়ি। দোতলায় তিনটি ঘরের পুবেরটি ঠাকুরদার, পশ্চিমেরটি বাবার শয়ন কক্ষ। ঘরেই তাঁদের আলনা, আলমারী, জুতো, জামা, অন্য সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পরিপাটি ভাবে গোছান। মাঝের ঘরটি বৈঠকখানা।

বছর চল্লিশ আগে সাহেববাড়ীর লোক এসে তখনকার দিনের

সাহেবী কায়দায় সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে, সেই থেকে পুরোন বাড়ী ছেড়ে নতুন বাড়ীতে উঠে আসা ছাড়া বৈঠকখানাটির কোনও উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্ত্তন হয়নি। আশে পাশে ভারী কৌচ কেদারার মধ্যে অর্দ্ধ-গোলাকৃতি চেয়ারে তিন জন লোকের বসবার আসন। ঘরের উত্তর-দক্ষিণের দেওয়ালে দুপাশে দুটি জানলার মধ্যে দরজা। দরজা জানলার মাথার ওপর দুখানি লম্বা ছবি। একটিতে নেপোলিয়ান সৈন্য সমাবেশের মধ্যে প্রসারিত হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন, অন্যটি যীশুর শেষ-ভোজন। তাছাড়া ফাঁকে ফাঁকে বিখ্যাত ছবির অনুকরণে আঁকা আরও দুচারখানি ছবি আছে। পুব-পশ্চিমের দেওয়ালের মধ্যে সোনালি ফ্রেমের দুখানি বড় আয়না। আয়নার সামনে ব্র্যাকেটে দুটি ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি। একটিতে সূর্য্যদেব ছ'-ঘোড়ার হাল্কা গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছেন, ঘোড়ার গতিবেগকে দমন করতে সূর্য্যদেবের হাতের পেশী ফুলে উঠেছে, অন্য হাতে চাবুক। অন্য মূর্ত্তিটি ডায়েনার, দুটি ছিপ্‌ছিপে কুকুর সামনে নিয়ে হাল্কা পায়ে ছুটে চলেছেন। আয়নার একপাশে বাবার ও ঠাকুরদার ঘরে যাবার সরু সরু এক পাল্লার দরজা, অন্য পাশে একটি করে ত্রিকোণ মার্ব্বেল পাথরের টেবিল। একটি টেবিলে গীর্জ্জার আকারের ঘড়ি, অন্যটিতে চিনেমাটির কল্‌সী, কল্‌সীর গায়ে ড্রাগন আঁকা। মেঝেতে বিবর্ণ সবুজ রংয়ের পুরু কার্পেট। প্রতি বুধবারে কার্পেট তুলে ঝাঁট দেওয়া হয়। পুরোন বাড়ীতে কার্পেট তোলা হলে আমি ছুটে আসতাম, সেখানে কালো পাথরের মেঝে, শাদা পাথরের শঙ্খ পদ্মলতার আল্‌পনা বুকে নিয়ে অনাদরে আত্মগোপন করে থাকত।

তিনতলার তিনখানি ঘরই আমার অধিকারে। পুবে শোবার,

মধ্যে পড়ার ও পশ্চিমে কাপড় পরবার ঘর। তাছাড়া উত্তরের বারান্দাকে পর্দ্দা টাঙিয়ে টেবিল চেয়ার সাজিয়ে খাবারঘররূপে ব্যবহার করি।

অসাধারণ রূপ ও বুদ্ধি নিয়ে নরসিংহপুরের বিখ্যাত মিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছি, নিজেব চেষ্টায় অর্জ্জন করেছি উচ্চতম কৃষ্টি, হলিউডের হিরোদের ঈর্ষা হবার মত সুগঠিত দেহ।

নরসিংহপুরের জ্ঞাতিদের শুধু নামটুকু বজায় আছে। জমিদারী ভাগে ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, নিজেরা দেনার দায়ে ঝাঁঝ্‌রা হয়ে বসে আছেন, এখনও বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝবার উপায় নাই। আমাদের কথা স্বতন্ত্র।

ঠাকুরদার পিতার আমল থেকে আমরা একপুরুষে বংশ, এবং কি কারণে জানি না প্রপিতামহ বেশ একটু হিসাবী ছিলেন। চাল বজায় রেখে কি ভাবে হিসাব মত চলতে হয় তা তিনি ঠাকুরদাকে, এবং ঠাকুরদাও বাবাকে শিখিয়েছেন। আমার পালা এখনও আসেনি, কিন্তু আমি জাতহিসাবী।

দামী সিগারেটের টিন হাতে নিয়ে হিসাব কষি, রোজ এতগুলি করে খেলে মাসে এতটা খরচ হবে। বেছে বেছে এমন সব সঙ্গীকে থিয়েটার সিনেমায় নিয়ে যাই, যাদের খরচে ভবিষ্যতে দেখবার আশা রাখা যায়। কলের মত আপনা থেকে মনে উদয় হয়, অনেকগুলি পাঞ্জাবী জমে গিয়েছে—দুবৎসর করাতে হবে না, একটা ভাল স্যুট অর্ডার দিই। শুধু বই কেনবার সময় এই সব দর কষাকষি করি না, ভাল বই আমার কাছে অমূল্য সম্পদ।

পূর্ব্বপুরুষরা ভবিষ্যতের বংশধরকে স্মরণ করেই কি এত কিছু জমিয়ে

গেছেন! বাড়ীই কতগুলি! পাহাড়ের চূড়ায় বাড়ী, পাহাড়ী জমিতে বাড়ী, সমুদ্রের পারে বাড়ী, দেশে থামওয়ালা রাজবাড়ী, জমিদারীতে কাছারি বাড়ী, শ্যামবাজারে মার্ব্বেল খচিত পুরোন বাড়ী, বালীগঞ্জে নতুন ধরণের নতুন বাড়ী। তাছাড়া খান পঞ্চাশেক ভাড়াটে বাড়ী, ব্যাঙ্কে প্রচুর নগদ টাকা, ছোটখাট রকমের একটি নিজস্ব অফিস।

এম-এ পাশ করে সেই আফিসে ছোট সাহেব রূপে পাঁচ বৎসর কাজ শিখব, তারপর বাবা অবসর গ্রহণ করবেন। চার পুরুষ ধরে এমনি চলছে, পাছে আমরা পাশবালিশ আঁকড়ে দিবানিদ্রা উপভোগ করতে করতে অকর্ম্মণ্য হয়ে যাই, সেই আশঙ্কায় ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষের দ্বারা প্রায় আশি বৎসর পূর্ব্বে অফিসটি স্থাপিত হয়।

ঠাকুরমা মারা যাবার সময় বাবা পাঁচ বৎসরের, পিসিমা দু' বৎসরের ছিলেন। মা সাড়ে তেরো বৎসর বয়সে আমাকে ছ' মাসের শিশু রেখে মারা যান, বাবার তখনো কুড়ি বৎসর পূর্ণ হয় নি। পাছে সংসারে ঝামেলা বাড়ে, আমার ভাগীদার জন্মায়, এই ভেবে পিসিদের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও ঠাকুরদা বাবার আর বিবাহ দেন নি।

সরকার মশাইকে নিয়ে বাড়ীতে দশজন চাকর। দু'টি ড্রাইভার, তিনটি চাকর, দুজন মালী, সরকার মশাই, ঠাকুর, মধুকাকা ওরফে মধু ভাঁড়ারি। মধু ভাঁড়ারির কাঁধে ঝাড়ন, কোমরে চাবির গোছা। এতগুলি লোক না রাখলে আমাদের মান থাকে না। এদের রান্নার বন্দোবস্ত আলাদা। জলের মত ডাল, জাব্‌দা চচ্চড়ি, অম্বল, কুচোমাছ।

ঠাকুরদা স্বল্পাহারী সকালে দুখানি বিস্কুট, এক পেয়ালা দুধে চায়ের রং করা। খবর কাগজ হাতে নিয়ে তিনি তারিয়ে তারিয়ে চা-টুকু উপভোগ করেন। মধ্যাহ্নে দু'হাতা পেশোয়ারী চালের ভাত,

কোনও দিন সোনামুগের ডাল, ভাজা, শুক্তো, কোনও দিন শুধু মাছের ঝোল, কোনও দিন ভাতে ভাত, গাওয়া ঘি। ভাতের সঙ্গে রোজই ছোট কষ্টি পাথরের বাটিতে চিনি পাতা দই থাকে। বিকেলে সামান্য ফল মিষ্টি। রাত্রে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা পটল বা বেগুন সহযোগে ছখানি লুচি ও একটি সন্দেশ। আমার জ্ঞান হয়ে অবধিই এই দেখে আসছি।

বাবা এককালে খুব খেতে পারতেন বলে মোটা হয়ে পড়েন, ব্লাড্‌প্রেসার বাড়ে। এখন ডাক্তারের নির্দ্দেশে তাঁর খাওয়া ফল, মূল, রুটি ভেজিটেবলের গণ্ডি ছাড়িয়ে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না।

ঠাকুরদা আমার জন্যে সরকার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে করে গিয়ে নানান রকম দেশী বিলাতী মিষ্টান্ন, ফল, মেওয়া, রকমারি চানাচুর ডালমুট কিনে এনে মধু ভাঁড়ারির জিম্মা করে দেন।

ভাল রান্না করতে পারে বলে আমার নিজস্ব চাকরটির মাইনে কুড়ি টাকা। সে ইলেকট্রিক ষ্টোভে আমার জন্যে রান্না করে। তা ছাড়া ঠাকুর যা কিছু তৈরী করে সব এনে তিনতলায় আমার জন্যে কেতা-দুরস্ত ভাবে পরিবেশন করে দেয়।

বাবা আমার রান্নার তত্ত্বাবধান করেন। "ঠাকুর আজও ভেটকি মাছ আনালে না কেন? কাল ত চেয়ে চেয়ে খাচ্ছিল। হরি তুই আজও ষ্টু করেছিস? সরকার মশাই কাল মুরগী এনে দেবেন,—গলদা চিংড়ি ওঠে নি?"

বাবার গোলগাল চেহারা, লাজুক লাজুক ভাব—রান্না বাড়ীতে টান দেখে মনে মনে তাঁকে আমি গিন্নি ঠাকৃরুন বলে ডাকি।

২

ঠাকুমা মারা গেলে বাবার, পিসিমার লালন পালনের জন্য ক্ষীরোদা নামধারিণী একজন ব্রাহ্মণের বিধবাকে নিযুক্ত করা হয়, হয়ত সেই কারণেই বাবা চাকরবাকরদের সঙ্গে খুব দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পারেন না। এটা মিত্তির বাড়ীর রীতি নয়। ঠাকুরদার চোখে পড়লে তিনি ভুরু কোঁচ্‌কান, মাঝে মাঝে বাবাকে মৃদুভর্ৎসনা শুনতে হয়—"হাসছিলে কেন? তুই তোকারি করে কথা বল কেন ইতর লোকেদের মত?"

পিতৃভক্তিতে বাবা রামচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তবুও ভুলো স্বভাবের দোষে এই সব প্রায়ই ঘটত। বকুনি খেয়ে বাবা ঘাড় হেঁট করে থাকতেন।

আকৃতি প্রকৃতিতে বাবার সঙ্গে ঠাকুরদার কোনও মিল ছিল না। ঠাকুরদার হলদে রং, দীর্ঘ ঋজু দেহ, খয়েরী টানা চোখ, ধনুকের মত ভুরু পাতলা ঠোঁট।

বাবা সাধারণের চেয়ে লম্বা এবং বিশেষ কিছু মোটা নয়, তা সত্ত্বেও ফাঁপা ফাঁপা গড়নের জন্য, কুঁজো হয়ে থপ্‌ থপ্‌ করে হাঁটার জন্য তাঁকে বেঁটেই দেখায়। বাবার গায়ের রং গোলাপ ফুলের মত। কালো কুচ্‌কুচে কোঁকড়ান চুল চিরুণীর বশ না মেনে ফেঁপে ফুলে থাকে। গোলগাল ভাসা ভাসা কালো চোখ, নাকের ডগাটি মোটা হওয়ায় নাকটিকেও গোল দেখায়। পুরু লাল ঠোঁট। গাল ফুলো গোল মুখ।

ঠাকুরদার চেহারা আমার ভাল লাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে

আমি তাঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল খুঁজি। মুখের কাট তাঁর লম্বা ডিম ধরণের, আমার ওভ্যাল্। নইলে চোখের রংয়ে, ভুরুর টানে, তিরতিরে নাকে, পাতলা ঠোঁটে মিল আছে। আমার সোজা নরম চুলে সোনালী আভাস। ঠাকুরদার চুলে অল্প ঢেউ, যৌবনে কি ছিল জানি না, এখন তাঁর চুল ধোপদস্ত কাপড়ের মত শাদা।

ভোরের ভ্রমণ থেকে সুরু করে রাত্রের আলো নিভিয়ে শোয়া সবই তিনি বাঁধা-ধরা নিয়মে চালান। আমার চোখে তাঁর পাপোষে রাখা চটি জোড়াটি, সোজা সিঁথিটি সব ভাল লাগে। বেশীর ভাগ সময় তিনি খাটে বসে থাকেন। পেছনে সেকেলে খাটের খোদাই করা ছত্রি, লম্বা ডাণ্ডায় রাজছত্রের আকারে বড় শেড্ লাগান আলো, হাতে উপনিষদ্ গোছের বই। সেক্সপীয়ারের লেখা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবারই যে পড়েছেন কে জানে।

তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করেন—"কি গো বিলিতি কার্ত্তিক কি চাও? কিসের জন্যে ঘুর ঘুর করছ বুঝতে পারছি, একখানি 'টু-সীটার' চাও? কি করে বুঝলাম? কালই দেখলাম সতৃষ্ণনয়নে পরের গাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছ। পরীক্ষার আগে নতুন উপসর্গ জোটাতে চাই না। নইলে অক্ষয়কে বলতাম একখানি কিনে দিতে। আজ সন্ধ্যায় হ্যামলেট নিয়ে আলোচনা করতে চাও? স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছি, আলোচনা করতে ঠিক মত শিখিনি। পরীক্ষার পর তুমি আমাকে শিখিয়ে দিও, তারপর আলোচনা করা যাবে। এখন পড়াশোনার দিকে একটু মন দাও দেখি।"

বাড়ীতে কি হয়েছে, হচ্ছে, হবে আমার কি জানতে ইচ্ছা করে

না? আমি কি পরিবারের একজন নই? জানবার জন্যে আমি একটি গর্হিত কাজ করি। সন্ধ্যা বেলায় বাগানে পায়চারী করবার ভাণ করে বাবার বৈঠকখানার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকি। এমন ভাব দেখাই চাকরদের চোখে পড়লে তারা মনে করে লুকিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে নিচ্ছি।

সন্ধ্যাবেলায় বাবার বৈঠকখানায় তিনজন ভদ্রলোকের আগমন হয়, বাবা তাঁদের সঙ্গে প্রাণখুলে গল্প-গুজব করেন। তাঁরা কারা কিছুই বুঝতে পারি না। বছর খানেক ত এইখানে প্রায় দিনই দাঁড়িয়ে থাকি, নামগুলি ছাড়া তাঁদের বিষয়ে আর কিছুই শুনি নি। তাঁরা নিজের কথা কিছুই বলেন না, তাঁরা বোধ হয় পারিষদ। বাবার গল্পের পুঁজি কম, এককথা বার বার বলেন, তাই তাঁরা আগ্রহ ভরে শোনেন ও তারিফ করেন। যে সব বাজে রসিকতা শুনে আমার হাড় জ্বলে যায় তাঁরা তাতে হেসে গড়িয়ে বলেন—"অক্ষয় আর হাসিও না ভাই—, পেট ফেটে যাবে, মানুষ খুনের দায়ে পড়বে শেষে।"

পারিষদে কি তুমি বলে সম্বোধন করে! তাঁরা বোধ হয় বন্ধু। বাবার সঙ্গ ছাড়া বাবার কাছে ত তাঁরা কিছুরই প্রত্যাশী নন। বৈঠকখানায় চা সিগারেট পান থাকে, কিন্তু সাতকড়ি মুখুয্যে ত চা সিগারেটও ছোঁন না। পানটা তিনি একটু বেশী পরিমানে খান, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ডিবে থাকে। বলেন—"অক্ষয় তোমার মশলা দেওয়া মিঠে পানে আমার মত দোক্তাখোরের সুবিধে হয় না ভাই।' তাই নিয়ে বাবা সাতকড়ির গৃহিনীকে উল্লেখ করে একটু হাসি তামাসা করেন।

এই সাতকড়ি একদিন ঝড় জলের মধ্যে এসে গেলেন।

বাবা মিইয়ে বসে ছিলেন, বন্ধুর আগমন বার্তা পেয়ে ঠাকুরদাদার

উপস্থিতি ভুলে সিঁড়ি থেকে চিৎকার করতে লাগলেন—"সাতকড়ি তুমি আমাকে এত ভালবাস?" সাতকড়ি হাতে স্বর্গ পেলেন।

বাবার খাটের কাছে টিপয়ের ওপর Wodehouseএর বই সর্ব্বদাই রাখা থাকে। বই পড়া আমাদের বংশের বাতিক। বাবার বই বন্ধুরাই সরবরাহ করেন। প্রভাত মুখুয্যে বাবার প্রিয় লেখক। পরশুরামের কথায় বলেন—"দত্ত তুমি যেদিন খবর আনলে, পরশুরাম আমাদেরই বোস, তখন আমার মনে হোলো, আমাদের কায়স্থদের মাথার কাছে কেউ নয়, আমরা বিষয় সম্পত্তি নিয়েই মলাম, নইলে সাহিত্য ক্ষেত্রে মুখুয্যেই বল আর চাটুয্যেই বল কাউকে দাঁড়াতে হোত না।"

বন্ধুরা বাবার জন্যে অনেক রকম খবর সংগ্রহ করে আনেন। আমার সঙ্গের যে ছেলেটি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ফার্ষ্ট হয়েছিল, সে মফঃস্বলের ছেলে। তার খবর সংগ্রহ করতে দীনু সরকারকে রীতিমত কাঠখড়-পোড়াতে হয়েছিল। সেই বদ্যির ছেলেটি নাকি বড় গরীব, বেঁটে, রোগা, ছোট ছোট চুলছাঁটা, সর্ব্বদাই বই মুখে বসে থাকে।

বাবা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—"তবেই বোঝ অজু, কি রকম ছেলে! বই না ছুঁয়েই সেকেণ্ড হয়েছে। চুলের পারিপাট্য করতেই তার দিনের মধ্যে অনেকটা সময় চলে যায়। না পড়ুক, টেনিসে কাপ্ পায় সেটাই কি কম কথা নাকি!"

ঠাকুরদার প্রসঙ্গে বাবা বলেন—"তোমরা বাবাকে যে রকম দেখছ, অটলকুমার কিছুতেই টলে না, সাতে পাঁচে থাকে না, ছেলেবেলায় দেখেছি বাবা ঠিক এই রকমটি ছিলেন না। রাগলে তাঁর জ্ঞান থাকত না। আমার যখন ন বছর বয়েস, খুকির ছয়, দুজনে ছাতে ঘুড়ি ওড়াচ্ছি, বাবা খবর পেয়ে আমার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে

আনলেন। খুকি ভয়ে ভয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে নেমে আসছে, বাবা যখন বল্লেন—'চল তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে খুন করে ফেলি।' খুকি আর থাকতে পারল না ডুকরে কেঁদে উঠল। খুকির কান্নায় বাবা আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। খুকির মত মেয়ে আর হয় না, সে স্বর্গের জিনিস এখানে থাকবে কেন ভাই? বাবা চলে গেলে ক্ষীরোমাসী কোথা থেকে ছুটে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। তখন মাসীর কান্নার পালা। আমার কানের অবস্থা দেখে মাসী যা বলেছিল, তা শুধু আমার কানে গিয়েছিল তাই রক্ষে, নইলে মিত্তির বাড়ীর ভাত খাওয়া সেইদিনই তার ঘুচত। সে বলেছিল—'হতভাগা মিনসে ছেলেটার কানের দফা সেরে রেখেছে। ছেলেমানুষকে একটা খেলনা কিনে দেওয়া নেই। আজকাল কেমন সব কলের ইঞ্জিন হয়েছে।' তার পরদিনই একটা ষ্টীমের রেলগাড়ী এলো। বড় একটা কাঠের বাক্স বোঝাই তার সরঞ্জাম। সাজালে বড় ঘরটা জুড়ে যেত। সে এক বিরাট ব্যাপার। তিন চারটে ইষ্টিশান, ট্যানেল ব্রিজ, পতাকা হাতে গার্ডসাহেব, অনুষ্ঠানের একটুও ত্রুটি নেই।

"আমার আর খুকীর নেশা ত হবেই, মাসী শুদ্ধ খেলনাটা নিয়ে মেতে গেল। বাবার বাইবে যাবার আশায় বসে থাকতাম তিনজনেই, মাসীর বড় যত্ন ছিল খেলনাটার ওপর। তার সাধ ছিল আমার ছেলেও যেন সেটা নিয়ে খেলা করে। কিন্তু অজুর ভাগ্যে সেটা পাওয়া ছিল না।"

বন্ধুরা বলেন—"খেলনারই ত প্রাণ!"

"প্রাণ তার খুব শক্ত ছিল হে। আমার নাতির নাতিও কিছু করতে পারত না। খাস জার্ম্মাণীর তৈরী দুশ' দশ টাকা দাম।

দার্জিলিং থেকে নামছি এত মাথা ঘুরছিল যে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শিলিগুড়িতে নামাতে ভুল হয়ে গেল, বেঞ্চির নিচে ছিল কি না। আমি জেগে থাকলে এটি ঘটত না। এতক্ষণে খেয়াল হ'ল গাড়ীর কথা। খুকিকে তাই নিয়ে কত বক্‌লাম। আমাদের প্রতীক্ষায় মাসী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল তার প্রথম কথা 'গাড়ী কই ?' বাবা শুনে খুব খুশি হয়ে বল্লেন 'হারিয়ে না গেলে আমাকেই গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসতে হোত। ধাড়ী ছেলে ঐ নিয়ে লেখাপড়া হয় না।' বাবা ছিলেন যেমন একগুঁয়ে ছিলেন তেমনি রাগী।"

ঠাকুরদার রাগের সঙ্গে আমার একটি দিন পরিচয় ঘটেছিল। আমার তখন সাত আট-বৎসর বয়স। ঘরে ডেকে নিয়ে এলেন। চোখ দুটো ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছিল। বল্লেন—"ফের যদি শুনি লেখাপড়া হচ্ছে না, সারাবাড়ী গাধার টুপি মাথায় দিয়ে ঘুরতে হবে। মনে থাকে যেন।"

চাপা গলার সেই হুঙ্কার, সেই জ্বলন্ত চাউনি, আজও ভুলতে পারি নি।

পিসিমার কথা বলতে বাবার কষ্ট হোত, কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গ প্রায় প্রত্যেক কথাতেই এসে পড়ত। মার গল্পও শুনতাম। পিসিমা মারা যেতে ঠাকুরদার কন্যা-স্থানীয়া একজন কাউকে প্রয়োজন হওয়ায় বাবার অত ছোটবেলায় বিয়ে হয়। মা আদুরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে এসে কান্নাকাটি লাগাতেন। বাবাও তখন পোড়ো ছেলে। সেইজন্য মা বিবাহিত জীবনের দেড় বৎসরের মধ্যে বড় জোর তিনমাস স্বামীর ঘর করেছিলেন। বাবার গল্প শুনে হাড় জ্বলে যায়। সেই তিনমাসের মধ্যে আমার বালিকা মা অত কীর্ত্তি করেছেন! সব মিথ্যে কথা।

আমার ছোটবেলার গল্প শুনতাম। মা মারা গেলে আমাকে

মামার বাড়ী থেকে নিয়ে আসা গেলো। ক্ষীরোদা আমার দেখাশুনা করত। তাছাড়া একজন অভিজ্ঞ বুড়ো ঝি'কেও রাখা হয়েছিল। আমার যখন আট মাস বয়েস, তখনকার একটি ঘটনা বাবা প্রায়ই বলতেন—"অজু দুরন্ত ছিল। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বাবা বই পড়ছেন। বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখি শ্রীমান্ অজয় কুমার হামা টানতে টানতে বেরিতে এলেন। বারান্দার কাছেই সিঁড়ি--যদি গড়িয়ে যায়! বাবার কাছে অজুকে নিয়ে কথা বলতেই লজ্জা করত, কোলে নেওয়া ত দূরের কথা। বুব ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। হঠাৎ বুদ্ধি জুগিয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠলাম 'গেল গেল ফুল গাছের টবটা গেল।' বাবা চমকে পিছনে ফিরে দেখে বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অজুকে বুকে তুলে নিলেন। তারপর বাবার কি রাগ। বুড়ি ঝি ত মুখের ওপর খুব চোটপাট,—'আপনারা বারান্দায় রয়েছ আমি কি করে আসি? দামাল ছেলে হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল, তা আমার কি দোষ?' বাবা তখন মাসীকে নিয়ে পড়লেন। মাসী স্নান করছিল তাড়াতাড়ি শুকনো কাপড় পরে বেরিয়ে এসে আড়ালে দাঁড়িয়ে তালপাতার মত কাঁপতে লাগল। বাবা বললেন—'বিবি সাহেবার স্নান করতে ক ঘণ্টা লাগে?' মাসী সেই মাত্র গেছে, স্নান করে পুজো আহ্নিক করবে, তারপর দুটি ফুটিয়ে খাবে। তার জন্যে সময় দেওয়া চাই ত। মাসী বাবার সামনে বেরুত না। ইচ্ছে করছিল বেচারীর হয়ে দু'কথা বলি, কিন্তু রুদ্র মূর্ত্তির সামনে কথা বলে ভস্ম হয়ে যাবার সাহস ছিল না।"

জানালায় দাঁড়িয়েই জানতে পারলাম হৃদয় ময়রার লেনে বাবার

একটি রক্ষিতা আছে। প্রায় কুড়ি বৎসর বাবা বুঁচির কাছে যাওয়া আসা করছেন, কেউ জানতে পারেনি। বন্ধুদের কাছে বাবা কিছুই গোপন করেন না, বুঁচিকে নিয়ে চাপা গলায় কি সব আলোচনা করেন সব কথা কর্ণগোচর হয় না। ইউনিভারসিটির ছাত্র অবস্থাতে তিনি দালালকে ডেকে একটি ভাল মেয়ে ফরমাস করেন। মেয়েটি যেন সাত হাত ঘোরা না হয়, দেখতে শুনতেও একটু ভাল হয়, এই চেয়েছিলেন। উৎসাহে বাবার গলা চড়ে যায়—"জান হে, প্রথম দর্শনে আমার ভাল লাগেনি। ওহে দত্ত তোমারই মত গৌরবর্ণ; মুখখানিও বোঁচা বোঁচা, ওরই মধ্যে গড়নে পেটনে একটু আল্‌গাছিরি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে কাকীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটাত। একজন ভুলিয়ে এনে বেশ্যাবাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে যায়। সেদিক থেকে বিধবা-বিয়ে করবার মত বিধবা হে। ইচ্ছে ছিল, ভাল পেলে বদলে নেবো, কিন্তু এখন তার বদলে আমি স্বর্গের অপ্সরীকেও চাই নে। ইচ্ছে ছিল ছোট খাট একটি বাড়ী কিনে তাকে বেশ্যাবাড়ী থেকে আলাদা করে রাখি, কিন্তু ভেবে দেখলাম তাতে ঝামেলা বাড়ে, জানাজানি হবার ভয় থাকে। হৃদয় ময়রার লেনে সেই বাড়ীর চারিদিকে খোলার বস্তি, দোতলায় নিজের খরচে একখানা ঘর করে নিয়েছি। ঝুরঝুরে হাওয়া। দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক থাকি, যা সেবা পাই, যত্ন পাই মন ভরতি হয়ে যায়। সে কিছুই চায় না। আমার অবর্ত্তমানে কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। বড় লাজুক মেয়ে, নইলে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।"

বন্ধুরা সসম্ভ্রমে বলেন—"না, না, থাক্ থাক্, তাঁকে বিব্রত ক'রে কি হবে।"

৩

বাবার ধাত্রীমাতা যাকে বাবা ক্ষীরোমাসী বলে উল্লেখ করেন তাঁর ইচ্ছে ছিল বাবার মত আমিও তাঁর আঁচলের তলায় থাকি। কিন্তু আমি ভিন্ন ধাতুতে গড়া। আমার দুরন্তপনা ক্ষীরোদিদি তেমন পছন্দ করত না। মুখে কিছু বলবার সাহস তার কোনও দিন না ঘটলেও ভুরুর ঈষৎ কুঞ্চন এবং কণ্ঠস্বরের সামান্য কম্পন থেকে আমার মত ছেলের পক্ষে তার বিরক্তি বোঝা শক্ত হয় নি। বিনিময়ে আমিই তার শুচিবাই, আর চাকরদের উপর সর্দ্দারী করা অপছন্দ করতাম।

চাকরদের ওপর আমার পক্ষপাতের কারণ ছিল। ফেরীওয়ালার টক-ঝাল মিশ্রিত ছোলা, বাদাম ইত্যাদির ফেরী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে চাকরদের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হোত। তারা সেই সব সুস্বাদু বিষ সংগ্রহ করে বইয়ের পেছনে লুকিয়ে রাখত। সরকার মশাই বলতেন—“খাবে বৈকি বাবা, কিছু হয়না খেলে, ও সব বড় লোকদের বাই। মধুর কাছে টাকা রেখে যাচ্ছি, যা হোক হিসেব লিখিয়ে দোব এখন!”

চাকররা ক্ষীরোদাকে পছন্দ করত না অথচ খাতির করে চলত। সে ভদ্রঘরের মেয়ে। সরকার মশাইও ভদ্রঘরের ছেলে—তাঁর সঙ্গে মুখে মুখে জবাব দিতে ত তাদের বাধা ছিল না। মধুকাকা বলত—“তাড়াতাড়ির সময় মাসীমা যদি এক আধটা তরকারী কুটে দেন কত, উপকার হয়। পুজো যেন ওঁর পালিয়ে যাচ্ছে।”

আমি শুনতে পেলে বলতাম—“নিশ্চয়ই। কুটবে না কেন? যাই তাকে ডেকে নিয়ে আসি।”

মধুকাকা বলত—"না খোকাবাবু তা কোরো না, ওতে আমাদেরই ক্ষতি হবে।" অভিভাবকদের যথেষ্ট আদর থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁদের ভয় করতাম। গোলমাল সৃষ্টি করবার সাহস ছিল না, নৈলে দেখিয়ে দিতাম।

সকালটা ক্ষীরোদা স্নান পুজো নিয়ে কাটাত। খাওয়ার পাট তার খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। ছোঁয়াছুঁয়ির সন্দেহ জাগলে সে না খেয়ে থাকত, তাকে দেখলে বোঝা যেত না যে সে উপোস করে আছে। বাবা তাকে নিজের মায়ের মত মনে করতেন দেখে আমি বাবার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলাম। ক্ষীরোর ওপর বাবার এতটা বেশী শ্রদ্ধা ছিল, যে তার মারা যাবার খবর পেয়ে বাবা তিনদিন নিরামিষ আহার করেছিলেন, রবারের জুতো প'রে অফিস যেতেন।

বিশ্লেষণ করে দেখেছি বাবার ওপর আমার বিতৃষ্ণার কারণ ক্ষীরো দিদি। ক্ষীরো আমাকে স্নেহ করতে চাইত। আমি নাড়ু খেতে ভালবাসতাম। ক্ষীরো নাড়ু নিয়ে আমাকে দিতে এলে আমি গম্ভীর মুখে বলতাম--"নাড়ু আমি ভালবাসি না।" নাড়ুর পাত্র নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমার মনে আনন্দ হতো, মনে হোত তবু যা হোক একটু প্রতিশোধ দিতে পারলাম। বাবা এসে নাড়ু দেখে হেসে বল্লেন—"কি মাসী, আমার জন্যে নাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ? দাও, দাও।" মাসীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠত।

বুঁচির কথা শুনে গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল, বাবার ওপর অবশিষ্ট শ্রদ্ধাটুকুও চলে গেল। এই জন্যেই বোধহয় ঠাকুরদাকে বেশি পছন্দ করি। কিন্তু ঠাকুরদা! হঠাৎ কেন জানিনা ক্ষীরো আর ঠাকুরদাকে পাশাপাশি মনে হতে লাগল। তন্বী কনকচাঁপার মত ক্ষীরোদা।

মাতৃহারা সন্তানদের লালনপালন করবার জন্যে সুন্দরী তরুণীর কেন প্রয়োজন হয়েছিল? মনের মধ্যে বাদানুবাদ সুরু হয়ে গেল।

ঠাকুরদার স্বপক্ষের লোকটি বল্লে—"পিসিমার ভার নেবার জন্যে ভদ্র ঘরের মেয়ে হিসাবে ক্ষীরোদাকে বাড়িতে স্থান দেওয়া হয়েছিল, তার রূপ-যৌবন আছে কি না-আছে অটলবাবু অত-শত দেখার প্রয়োজন মনে করেন নি। জিনিষটা একটু দৃষ্টিকটু, তা ছাড়া অন্য রকম মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে কি? প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, ক্ষীরোদাকে বিদায় দিতে অটল বাবু একটুও কুণ্ঠিত হন নি। ও ধরণের সম্বন্ধ থাকলে কি এটা সম্ভব হোত?"

ক্ষীরোদার বিদায়-দৃশ্য মনে পড়ে গেল। আমার যখন দশ বৎসর বয়েস, শরীর খারাপ নিয়ে ক্ষীরোদা দেশে গেল। বছর খানেক পরে ছ্যাকড়া গাড়ীর মাথায় পরিচিত রং-চটা টিনের বাক্সটি চাপিয়ে ফিরে আসায় ঠাকুরদা রাগারাগি করতে লাগলেন—"কার হুকুমে ক্ষীরোদা এলো? পাড়াগাঁয়ে তার শরীর খারাপ হয়? এখানে যদি তার অসুখ করে, কে সেবা করবে? ভাই, ভাজ জমি, জমা, সব রয়েছে। বুঝেছি, কলকাতার কলের জলের মায়া কাটানো বড় শক্ত।"

আমার স্বভাবে আড়িপাতা দোষটি ছোটবেলা থেকেই ছিল। বাবা আমৃতা আমৃতা করে ক্ষীরোদার হয়ে ওকালতী ক'রছেন, কিন্তু ঠাকুরদা অটলকে টলান গেল না। ঠাকুরদার ন্যায়-বিচার দেখে মনে মনে আমি তাঁর ওপর খুশী হয়ে উঠলাম।

বাবা ক্ষীরোদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"মাসী পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কাজ কি? তুমি সাতকড়ির ওখানে গিয়ে থাক। তার বৌটি অতি

ভাল মানুষ, তোমাকে নিজের শাশুড়ীর মত যত্ন করবে। আমি সব খরচ পত্র দোব।"

মাসী সজল চক্ষে বল্লেন—"না বাবা, তোমাদের কাছে থাকতে প্রাণ চায়, নইলে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গাঁয়ে থাকতেই ভাল লাগে।"

বাবার মাসীর জন্যে ছ্যাকড়া গাড়ী এলো। টিনের বাক্সটী গাড়ীর মাথায় চাপান হলে বাবা বল্লেন—"মাসী নিয়মিত চিটি পত্র দিও দত্তের ঠিকানায়, নইলে ভাব্‌ব। যা দরকার হবে জানাতে ভুলো না কিন্তু। অজুর বিয়েতে তোমার আসা চাই, নইলে—"

মাসী ধরা গলায় ম্লান হাসি হেসে বল্লেন—"কিন্তু বাবা, তোমার বাবা—"

"বাবার বাবাকেও খাতির করবো না তখন। কতবারই ত যমের হাত থেকে আমাকে টেনে এনেছ, নইলে অজুকে পেতেন কোথা থেকে শুনি?"

মাসীর গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বোন্‌পো চোখের জল গোপন করবার জন্যে হেঁট হ'য়ে মাসীর পায়ের ধুলো নিলেন।

মনের মধ্যের বিপক্ষ থেকে প্রতিবাদ এলো—"এটা দোষ ক্ষালনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বড় লোকদের সখ মিটে গেলে এ রকম ব্যাপার ঘটে। চাকর বাকরদের কথা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, বৈধব্যের মধ্যেও ক্ষীরোদার তিনবার সন্তান সম্ভাবনা হয়েছিল।"

শরীর খারাপ নিয়ে ক্ষীরোদা দেশে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আলুভাজার সন্ধানে রান্নাবাড়ীতে গিয়েছিলাম। কানে গেল মধুকাকা বলছে—"এই নিয়ে তিনবার হলো। বামুনের মেয়ের এদিকে ত পট্‌পটানি কত!"

বুঝলাম ক্ষীরোদিদির কথা হচ্ছে। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম "কি তিনবার ঠাকুর ?"

ঠাকুর থতমত খেয়ে বল্লে—"তিনবার উনুনে কড়া চড়ালুম না।"

—"তিনবার কড়া চড়ালে! সে আবার কি ?"

মধুকাকা ঠাকুরকে ধমক দিয়ে উঠল,—"ঠাকুরের যেমন কথা! তিনবার উনুনে কয়লা দিলে, কয়লা বড় সস্তা, নয় ?"

ঠাকুর হাসি গোপন করবার জন্য মুখ নীচু করে নিলে, বুঝলাম একটা কিছু লুকানো হোল। বাটি ভরা আলু ভাজা পেয়ে চলে গেলাম।

—"কিন্তু তার জন্যে অটলবাবুকে দায়ী না করে সরকার মশাইকেও দায়ী করা যায়।" ঠাকুরদার স্বপক্ষের মন আবার বললে।

কিন্তু প্রতিবাদ আসে। "সরকার মশাইয়ের বিরুদ্ধেও কিছু শোনা যায় নি। তাছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট প্রমাণ রয়েছে—যেমন কর্ত্তাবাবু সকলেরই পিতৃস্থানীয়, মধ্যে থেকে ক্ষীরোদার ভগিনীপতির স্থান অধিকার করলেন কেন? ক্ষীরোদার খেলনা রেলগাড়ীর বাসনা কি করে পুর্ণ হোলো ? সে ত প্রকাশ্যে অটলবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলত না।"

"অটলবাবুর মাতৃহীন ছেলে মেয়েই হয়ত ক্ষীরোদাকে মাসী বলে ডাকতে সুরু করেছিল। কলের গাড়ীর কথা ত' খুকিও বাপকে জানাতে পারে। খুকি বাপের আদুরে মেয়ে ছিল।"

কিন্তু অটলবাবুর লাল হ'য়ে ওঠার ঘটনাটা ?

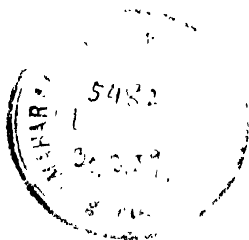
ঘটনাটা হালের। দিনের মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঠাকুরদা দুটি মিঠে খিলি খান। কারুর পান সাজা তাঁর পছন্দ হয় না, তাই

নিয়ে প্রায়ই খিট্ খিট্ করেন, "মধু আজকাল কী পানই সাজছ? ঠাকুরকে সাজতে দিও।—ঠাকুর তুমি ত' প্রথম প্রথম বেশ সাজতে, এখন মন দাও না, নাকি? হরিকে সাজতে দিও। হরি, তুমি উড়িষ্যার লোক, পান সাজতে জান না? মধুই যেমন সাজছিল, সাজুক।"

দেখে শুনে আপনা থেকেই একদিন মুখ থেকে বার হ'য়ে গেল—"ক্ষীরোদিদি বেশ পান সাজত, তার আমলে একদিনও পান সাজা খারাপ হয় নি।"

ঠাকুরদা চম্‌কে আমার দিকে চাইলেন। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নিচু করে নিলেন। তাঁর কাঁচা সোনার রংয়ে কে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিলে। কানের ডগা টক্‌টকে লাল। তখনই মনে খট্‌কা লেগেছিল, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

ঠাকুরদার স্বপক্ষের উকিলটি আর মাথা তুলতে পারলেন না। ঠাকুরদাও সিংহাসন শুদ্ধ তর্‌তর্‌ করে বেশ খানিকটা নেমে গেলেন।



পরীক্ষার আগে মাস কতক পড়াশোনায় মন দিয়েছিলাম। পরীক্ষার পর কি করা যাবে, প্ল্যান ঠিক করা ছিল। কাল শেষ দিন ছিল, বহু দিন পরে কাল বাবার জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম। যা শুনলাম, তাতে পরীক্ষার দায় থেকে উদ্ধার পাওয়ার আনন্দ, ভালো পরীক্ষা দিতে পারার আনন্দ সব হারিয়ে ফেললাম। ইতিমধ্যে তলে তলে আমার জন্যে পাঁচটি পাত্রী দেখা হ'য়ে গিয়েছে, আজ ষষ্ঠকে দেখতে যাওয়া হবে।

বাতিল করা পাত্রীদের মধ্যে একটি পাউডার পাফের মত থুপ্‌থুপে, একটি পাট কাঠির মত রোগা। তৃতীয়টির সম্বন্ধে বাবা বল্লেন—"গো-জন্ম থেকে যে ঘটক-জন্ম হয় সে বিষয়ে আমার আর একটুও সন্দেহ নেই। বারাসাতের ডেপুটির মেয়েটিকে দেখলেই আমরা মুগ্ধ হ'য়ে যাবো ঘটক চূড়ামণি জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন। মেয়েটির রং কি রকম জান? এই রাস্তায় ঘাটে যে সব মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে যারা একটু ফরসা তাদের মত। তবে হ্যাঁ একটি মাত্র মেয়ে, মেয়েটির জন্যে খরচ করে। পৃথিবীতে যত রকম বাজনা আছে সব বাজাতে শিখেছে। সেতার, এসরাজ, বেহালা, ব্যাঞ্জো, জলতরঙ্গ, কাটিতরঙ্গ, ঘুমুর তরঙ্গ, সুরবাহার, আরও কত কি বাহার ঘর ভরতি কত কি? চোখে দেখা দূরে থাক, নামও শুনিনি সে সব যন্ত্রপাতির। তিনটে মাষ্টার রেখে বাড়ীতেই পড়াচ্ছে।"

চতুর্থটি পাড়াগাঁয়ের বনিয়াদি জমিদার বাড়ীর মেয়ে। সেই দুর্গম

পথে গাড়ী খানায় পড়বার দাখিল হয়েছিল, অল্পের জন্যে প্রাণ বেঁচেছে। মেয়েটি সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা, কিন্তু তারা পাড়াগেঁয়ে, আমার পছন্দের সঙ্গে মিলবে না বলে তাকে বাতিল করা হোলো।

সাতকড়িকে সম্বোধন করে বাবা বল্লেন—"জান দাদা, বামুন হ'য়ে বেঁচে গেছ। আমাদের কায়স্থদের বারো বায়নাক্কা পোয়াতে হ'লে দেখতে! বড় ছেলের কুলিনের মেয়ে চাই। নিজেরা মিত্তির, ঘোষ বোসের গণ্ডিটুকুর মধ্যে কি করে যে একটি ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে? বামুন মানুষ আশীর্ব্বাদ কর দেখি প্রাণ খুলে। আমার আবার ঘোষের ঘরে কাজ করতে ইচ্ছে করে না। ঘোষ শুনলেই মনে হয় গয়লা। কথায় কিন্তু আছে—ঘোষ বংশ মহা বংশ, বোস বংশ দাতা। মিত্তির কুটিল বড়—শেষ করলাম না, দত্তের গায়ে লাগবে।"

পঞ্চমটি যাকে পরশুদিন নাকচ্ করা হয়েছে, বিবরণ শুনে তার ঠিকানা জানতে ইচ্ছে হোলো। বাবার মতে একটু বেশী পরিমাণে লম্বা ছাড়া তার আর কোনও খুঁৎ নেই। ঘরে পড়ে অতি অল্প বয়সে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছে—আসছে বারে আই-এ দেবে। গান গেয়ে অনেকগুলি মেডেল যোগাড় করেছে।

বাবা বল্লেন—"জান দীনু তুমি গান শুনতে ভালবাস—তোমার জন্যে মন কেমন করছিল। তানপুরা বাজিয়ে ঠুংরি-মুংরি বেশ গাইলে, ছোট ভাইটি তবলায় চাঁটি দিতে লাগল, রীতিমত বৈঠকী গান। হঠাৎ নজরে পড়ল মেয়েটির খড়ম পা, হাসলে গালে সামান্য টোল খায়। এ সব লক্ষণ ত ভালো নয়। আহা পরের মেয়েটি জন্ম এয়োস্ত্রী হোক।"

গ্রীক ষ্টাচুদের খিলান করা পা—টোল খাওয়া গালের মহিমা পড়েছি, এখনো দেখবার সাধ মেটেনি।

চারটে বাজতে না বাজতেই গাড়ী প্রস্তুত। ওঁরা সাজ-গোজ করে মেয়ে দেখতে বেরিয়ে পড়লেন। ঠাকুরদার পায়ের জুতো থেকে মাথার সিঁথি, আগাগোড়া ধব্ধবে সাদা। বাবা সঙ্কুচিত হ'য়ে পাশে বসলেন, কালো বার্ণিশ করা জুতো, ফিতেপাড় ধুতি চুনোট করা, জরিপেড়ে উড়ুনি। ওঁরা যে রকম উঠে পড়ে লেগেছেন—

আমি আজই জানিয়ে দোব—কিন্তু আমার মতামত ত কেউ চায় নি। গায়ে-পড়া হয়ে কিছু বলতে গেলে যদি ঠাকুরদার চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে জলে ওঠে? চাপা গলায় যদি গর্জ্জন করে ওঠেন—"ফের যদি এ রকম কথা শুনি বাড়ী থেকে বার হয়ে যেতে হবে, মনে থাকে যেন।" তখন কি হবে? হয় অপমান সহ্য করে বাড়ীতেই থাকতে হবে, নয়ত একটা চাকরী জোগাড় করে অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন—।

স্বাধীন হ'লে কি কি সুযোগ পেতে পারতাম, মনে করেই সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

স্বাধীন হলে ত বন্ধু স্বপনের বোন জলিকেই বিয়ে করতে পারি। স্বপনের বাবা কলকাতার বিখ্যাত ধনী—সোনার বেনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একটি ব্রাহ্মমেয়ের সঙ্গে প্রেম হওয়ায় ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লিখিয়ে মেয়েটিকে বিবাহ করেন। তাঁর সৌভাগ্যক্রমে বাপ-ঠাকুরদা বেঁচে না থাকায় কোন বাধা পেতে হয়নি।

জলি মেয়েটি সাজ-গোজ করে আমার চোখে পড়তে চায়। একদিন তাকে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে স্বপন জিজ্ঞাসা করলে—"অজয় বল ত, জলি কি সেজেছে?"

জলির পরণে ঢেউ-এর মত হাল্কা ধব্ধবে সাদা শাড়ী, কমলা

রংয়ের পাড় বসানো, পুরো হাতের পাতলা সাদা জামা, কমলা রংয়ের ওয়েষ্ট কোট, হাতে, গলায়, কানে, কমলা রংয়ের কাঁচ-কড়ার গয়না। কি সেজেছে ধরতে পারছিলাম না, দেখছিলুম জলিকে বেশ দেখাচ্ছে।

স্বপন বল্লে—"জলি শিউলি ফুল সেজেছে। কিন্তু, জলি, শিউলি ফুলে কালো কালো চুল রাখলি কেন? চুলগুলো টেনে বেঁধে অরেঞ্জ কি সাদা রুমাল দিয়ে ঢেকে দিলেই ত পারতিস্।"

আমি বললাম—"তাতে কি খুব বেশী মানাত? দু' পাশের বিনুনি দুটিকে দু'খণ্ড পাতা কল্পনা করা কি এতই শক্ত?"

জলি খুশি হয়ে আমার দিকে চাইলে। কিন্তু জলিকে বিয়ে করা হবে না। স্বপনের মুখে শুনেছি, আমাকে নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করে। আমি নাকি মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারি না, জলিকে কখনও তুমি, কখনও আপনি বলে কথা বলি। তা ছাড়া জলি কি এমন? বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে সুন্দরী ত নয়ই, তার ষোলো সতেরো বৎসর বয়েসে খুকিপনা, পাকাপনা দুটোই যে তার পক্ষে বেমানান, এটুকু সাধারণ জ্ঞান যে মেয়ের নেই, তাকে বিবাহ করা চলে না।

খাপছাড়া ভাবে কত কথাই মনে আসতে লাগল। স্বপনের বাবা অনেক কিছু রেখে গেছেন। বিধবা মা, ঐ দুটি ভাই বোন। উইলে জলিকে কত দেওয়া হয়েছে কায়দা করে জেনে এলে হয়।

পাটভাঙ্গা কাপড় জামা পরে বেরিয়ে পড়লাম। এই নিয়ে জীবনে তিনবার ট্রামে চড়া হোলো। এবার বেশ লাগছে—কত লোক উঠছে নামছে, কেমন সার্বজনীন ভাব! একজোড়া স্বামী-স্ত্রী উঠে পাশাপাশি বসল, মেয়েটিকে লাল পাড় কালো বিষ্ণুপুরি শাড়ীতে বেশ মানিয়েছে।

বোধ হয়, নববিবাহিতা; গয়না কাপড় এমন কি সিঁথির সিঁদুরটুকুও যেন নূতন ঝকঝকে। খুঁজলে কতই খুঁৎ বার হবে, তা সত্ত্বেও মেয়েটিকে দেখে চোখ ফেরান যায় না। ছি, ছি, অশোভন ভাবে অনেকক্ষণ চেয়ে আছি। মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

মনে পড়ে গেল আজ রবিবার, সহপাঠী প্রবীরকে কথা দিয়েছিলাম পরীক্ষার পরের রবিবারে তাদের নব-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় গিয়ে তার তরুণ বন্ধু সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হব। তাঁদের মধ্যে কয়েক-জনের লেখা আমার ভাল লাগে। বেশ ঝরঝরে তরতরে বাংলা—পড়লেই বুঝতে পারা যায় বিদেশী সাহিত্য তাঁরা চষে ফেলেছেন। তাঁরা আমার ইংরাজী লেখা পড়ে মুগ্ধ, আমাকে বাংলা ভাষার চর্চা করতে অনুরোধ করবেন। প্রবীর আমার ও সাহিত্য সভার মধ্যে হংসদূতের কাজ করছে।

জলির বাড়ী যাওয়ার উৎসাহ ক্রমেই কমে আসছিল। সাহিত্য সভায় যাব স্থির করে ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম। বৌটির স্বামী লেডিস সিট ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে গেছে, বৌটির মুখের ভাব বিরহিনী সীতার মত। পাশের মেমটি যেন চেড়ী, মুখের ভাব কটকটে, ধারাল নখে, পুরু ঠোঁটে রক্ত মাখা।

সাময়িক ভাবে আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলাম, তাই বাসে উঠে পড়লাম—কলেজ ফেরতাদের ভীড়। একজন অধ্যাপকও চলেছেন, বেশ সুখী ভদ্রলোক, কোনও রকম ক্লান্তির চিহ্ন নেই, অনর্গলকথা বলে চলেছেন, পরিচিতদের সঙ্গে, খবরাখবর নিচ্ছেন, অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করছেন। তাঁর উপদেশগুলির মূল্য আছে। একজনকে দেখে বল্লেন—"কি হে তুমি আর গেলে না যে?"

সে বিনীত ভাবে বল্লে—"স্যার্, এখন আমি Heat-এর বিষয় পড়ছি—"

"Heat সম্বন্ধে সেদিন একটা ভাল বই পড়লাম। যেও একদিন বুঝিয়ে দোব।"

ছেলেটি ভক্তিভরে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে নেমে গেল।

ভবানীপুর অঞ্চলে একটা সিনেমা হাউস চোখে পড়ল। একটা ভাল বই দেখাচ্ছে। বইটির গরম অবস্থায় "নিউ এম্পায়ারে" দেখেছিলাম, দ্বিতীয় বার দেখবার মত বই। বাস থেকে নেমে পড়লাম।

ফিরতে রাত প্রায় দশটা বাজল। এখনও ওঁরা মেয়ে দেখে ফেরেননি। মধু কাকা ভাবছে,—ভাবনা আমাতেও সংক্রামিত হোলো। কোনও বিপদ ঘটল নাকি! গলা দিয়ে লুচি নামতে চায় না, কোনও রকমে খাওয়া শেষ করে গাড়ীবারান্দায় দাঁড়ালাম। ওঁদের গাড়ী বাগানে প্রবেশ করল।

শুনলাম, ঠাকুরদা চিৎকার করে বলছেন—"আমরা খেয়ে এসেছি, তোমরা খেয়ে নাও।"

বাবা ও ঠাকুরদা অন্তরঙ্গ ভাবে গল্প করতে করতে ওপরে উঠছেন, কি অভাবনীয় ব্যাপার! ওঁদের কলরব থেকে যা শুনতে পেলাম, তা থেকে বোঝা গেল বিবাহ পাকাপাকি স্থির করে এক পেট গিলে আসার জন্যেই এতটা দেরী হয়ে গেল।

দৃষ্টি এড়িয়ে ওপরে উঠে এলাম।

একটু পরে ঠাকুরদার ঘরে আমার ডাক পড়ল। তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে ফাল্গুন মাসে বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। পাত্রীটি অসাধারণ সুন্দরী, সাধারণ রকম লেখাপড়া এবং গান বাজনা জানে।

আমি আম্‌তা আম্‌তা করে প্রতিবাদ জানাতে ঠাকুরদার মুখ কঠিন ভাব ধারণ করল। তিনি বিশুদ্ধ ইংরিজিতে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কথার সারমর্ম্ম হল—

এতদিন আমি ছাত্র অবস্থায় ছিলাম, বিবাহের কথা ভাববার অবসর পাইনি, সেটা স্বাভাবিক ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এখন অবিবাহিত থাকার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই। ওঁরা বিবেচক ও শুভার্থী। এক্ষেত্রে পাত্রী সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা আমার পক্ষে অনুচিত। ওঁদের নির্ব্বাচিতাকে বিবাহ করতে আমি বাধ্য।

পরিশেষে ইঙ্গিতে জানালেন, আমার বাপের যা করবার সাহস হয়নি, সে রকম ধৃষ্টতা উনি সহ্য করবেন না।

নিস্ফল রাগে গায়ের রক্ত ফুটতে লাগল। অনুভব করলাম মুক্তির উপায় নেই। আমি হাজার রকম বন্ধনে বদ্ধ জীব। কিন্তু তাই যদি হয় ত বাবার মত নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নই কেন?

চলতি রীতি অনুসারে বন্ধু বান্ধব নিয়ে কনে দেখতে যাবার প্রস্তাব এলে গম্ভীর মুখে অস্বীকার করলাম।

রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলে দেখলাম, ঠাকুরদা আজকাল আকুল নয়নে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। তিনি তাঁর প্রচণ্ড মর্য্যাদাবোধকে অনেক

পরিমাণে খাটো করে হাস্যকর ভাবে ছেলেমানুষী করতে লাগলেন। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাবাকে যে সব কথা বলতে লাগলেন, শুনে হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

"অক্ষয় একটা ভাল 'হারমোনিয়ামের' অর্ডার দিয়ে এসো। এতদিন বাড়ী যেন অসুরপুরী ছিল, এই বার গান শুনে প্রাণ জুড়োবে ! দিদিমণির গলাটি পাখীর মত মিষ্টি।"

"অক্ষয় দিদিমণির হাতের-লেখা-কাগজখানি মাঝের ঘরের কোণের টেবিলের ওপর একটা কিছু চাপা দিয়ে রেখে এসো, তোমার পিসিমারা দেখবেন। লেখা দেখেছ যেন মুক্তোর মত।"

আমি একটু অধিক মাত্রায় কৌতূহলী, না দেখে থাকতে পারলাম না। উজ্জ্বল কালীতে দামী নীল্‌চে কাগজের ওপর, ইংরিজিতে বাংলায় সযত্নে লেখা আছে 'কুমারী নিরুপমা'।

আমার মনকে অনুকূলে আনবার জন্যে ঠাকুরদার মস্তিষ্কে অনেক রকম ফন্দী গজাতে লাগল। ভালো ফটোগ্রাফার দিয়ে কুমারী নিরুপমার ছবি তুলিয়ে সেই ছবির ছোট ছোট প্রতিলিপি আত্মীয় স্বজন মহলে বিতরণ করা হোলো। কুটুম্বদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে, তাঁদেরকেও বঞ্চিত করা হোলো না। ফলে ভগিনী-পতি স্থানীয়দের, সমবয়সী ভাই সম্পর্কীয়দের সঙ্গে দেখা হলে, সুন্দরী বধূলাভের জন্যে অভিনন্দন পেতে লাগলাম। বৌদি সম্পর্কীয়ারা ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লেন—"এমনিতেই ত ঠাকুরপো আমাদের সঙ্গে মেশে না, এখন ত দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে।"

তারপর একখানি সুবর্দ্ধিত আকারের ছবিকে বাড়ীর এমন জায়গায় টাঙানো হোলো যে, দিনের মধ্যে অনেকবার ছবির ওই হাস্যমুখী

কিশোরীর সঙ্গে চোখে চোখে মিলন না হবার উপায় রইল না। কিশোরীকে সাগরপারের রাণীদের আদর্শে মুকুট পরান হয়েছে, কিন্তু বিদেশের সিংহাসনে আকর্ণ বিস্তৃত কাজল টানা চোখ, পান কাটের মুখ মানাবে কি ?

রোজই একটা না একটা হাসির খোরাক জোটে। ক্রমে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলাম। এমন কি দেরীর জন্যে একটু অধৈর্য্য ভাবও এসে গেল। মনে হ'ল প্রেমে পড়া আমার ধাতে নেই। কার পায়ের কাছে টুপী রেখে হাঁটু গেড়ে বসব ? জলির মত মেয়ে সেও আমার কাছে পুজো পেতে চায় ! উপন্যাসের নায়িকাদের মনে পড়তে লাগল, ধৈর্য্য ধরে বসে থাকলে প্রিয়ার দর্শন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সুযোগ কই ! এমনিতেই ঠাকুরদা শীলেদের বাড়ী যাওয়া পছন্দ করেন না। তাঁর বিশ্বাস স্বপনের মা শ্রীধর শীলকে শীকার করেছিলেন।

শীর্ষদেশে আমার নাম নিয়ে পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। জানা কথা, তবু যেন বাড়ী নতুন করে আনন্দময় হ'য়ে উঠল। ঠাকুরদা আমাকে বুকে জড়িয়ে বল্লেন—"তুমি যে দেখছি মিত্রকুলকে উজ্জ্বল না করে ছাড়বে না।"

সেই দুর্লভ আলিঙ্গন আমার মনে বিন্দুমাত্র সাড়া জাগাতে সক্ষম হোলো না।

বিবাহের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর হাওয়া বদলে যেতে লাগল। স্যাকরা, কাপড়ওয়ালা, দরজীরা ঘোরাফেরা করতে লাগল। পরামর্শ দেবার জন্যে বাবার পিসিদের ঘন ঘন আগমন হতে লাগল। বিশেষ অনুরোধে নিজেদের বাড়ীর অসুবিধে ঘটিয়ে, তাঁরা সাময়িক

ভাবে গৃহিনীপনা করবার জন্যে থেকে গেলেন। 'কান টানলে মাথা আসে' প্রবাদ বাক্যটির সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে বাবার পিসে-মশাইদের মধ্যে যে ক'জন বেঁচে ছিলেন, তাঁরাও দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় আমাদের বাড়ীতেই থাকতে লাগলেন। বাড়ীর হাওয়া হাসির হিল্লোলে ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হয়ে উঠতে লাগল।

অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হোলো, উপস্থিত ঠাকুরদার মার জড়োয়া গয়নাগুলি দিয়ে নববধূকে আশীর্ব্বাদ করা হবে। পরে নানা উপলক্ষ্যে দেবার জন্যে ঠাকুরমার ও মার গয়নাগুলি রেখে দেওয়া হোলো। মিত্রবাড়ীর মর্য্যাদা রাখবার জন্যে একসেট হীরার গয়না অর্ডার দেওয়া হোলো, যার দাম ঠাকুরদার হিসেবে কুড়ি হাজারের মধ্যে থাকলেও, কার্য্যক্ষেত্রে পঁচিশ হাজারের ওপরে লেগে গেল। নিরুপমার উজ্জ্বল গৌরবর্ণে বেশ মানাবে বলে একসেট পান্নার গয়না অর্ডার দেওয়া হোলো। বাবা সলজ্জভাবে জানালেন, টুকটুকে বৌমাকে চুনির গয়না পরাতে তাঁর সাধ! বলা বাহুল্য তাঁর সাধও অপূর্ণ রইল না।

ইতিমধ্যে ভাবী বধূমাতার সঙ্গে বাবার বেশ ভাব জমে গিয়েছে। বাবা তাকে 'টারজেনে'র ছবি দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন। তাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে ছ'খানি দামী বেনারসী পছন্দ করিয়ে নিয়ে আসা হল। বাবা বল্লেন—"জান ছোটপিসিমা, আমি বল্লাম 'আমার পিসিমাদের আমি ছ'খানি বেনারসী দিতে চাই, তুমি পছন্দ করে দাও।' মা লক্ষ্মী ঠকে গেলেন।" সকলে হেসে উঠল। নতুন বৌয়ের নতুন নামকরণ হোলো, 'অক্ষয়ের নতুন পিসি।'

আমি সব জিনিষই লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম। আমাকে নিয়ে

কারুর বিশেষ কোনও সুবিধে হোলো না। আমার মুখে দুঃখের ছাপ দেখলে, আপন জনেরা আমাকে উৎসাহিত করবার জন্যে যা হোক কিছু করতেন। আমার মুখে খুশির ভাব দেখলে ঠাট্টা করবার সুযোগ পেতেন। আমি এই দুয়েরই বার হ'য়ে নির্লিপ্ত উদাসীনের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

বিবাহে প্রাণ খুলে খরচ-পত্র করে বাড়ীখানিকে ইন্দ্রপুরী করে তোলা হল। আমার মৃদু আপত্তি না মেনে, আমাকে চন্দন, ফুলের মালা, বেনারসীর জোড় পরিয়ে সাজান হলে শঙ্খধ্বনির মধ্যে গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

বরের গাড়ীখানি রাশি রাশি সাদা ফুলের সাহায্যে রাজহংসের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল নকল রাজহংসকে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের গল্পটা শুনিয়ে আসি। কথাটা মনে উদয় হ'তে—ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। হাসি দেখে ঠাকুরদা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

অপর পক্ষের লোকেরাও ধনী। বিয়ে বাড়ীতে জাঁক জমকের অভাব নেই। তাঁরা বোধহয় আমাদের মত সুরুচিসম্পন্ন নন। বিয়ে বাড়ীতে শৃঙ্খলার অভাব, হট্টগোলের পরিমাণ বেশী। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব লক্ষ্য করছিলাম, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে নম্রতাপূর্ণ আন্তরিক ভদ্রব্যবহার দেখে মুগ্ধ হলাম।

শুভদৃষ্টির সময় দেখলাম, প্রচুর অলঙ্কার, জ্যাবড়া বেনারসী, চুমকী-বসান ভেল, অতিরিক্ত পরিমাণে কনেচন্দন, রং পাউডার ইত্যাদির সাহায্যে নিরুপমা রূপসীকে অনেক পরিমাণে চাপা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এতগুলি গায়ে-পড়া অল্পবয়সী মেয়ে নিয়ে বেহায়াপনা করবার সুযোগ জীবনে আর পাব না ভেবে বেশ চুটিয়ে রসিকতাও করলাম।

ফুলশয্যার পরদিন চোখ থেকে ঘুম ছাড়তে চায় না। ঘুমের মধ্যেও মনে হচ্ছিল পাড়াগেঁয়ে বলে যে মেয়েটিকে অপছন্দ হয়েছিল তার মধ্যে হয়ত কতকটা বৈচিত্র্য থাকত। শহরের অমার্জিত মেয়ে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাবার বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

অষ্টমঙ্গলায় নববধূকে বাপের বাড়ী রেখে এলাম। কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে কথাবার্ত্তা স্থির হ'য়ে গেল যে অক্ষয়-তৃতীয়ায় সে স্থায়ী ভাবে ঘর করতে আসবে।

আচারে ব্যবহারে সকলেই নূতন বৌয়ের উপর সন্তুষ্ট। বাবার বাৎসল্য-রসের মাত্রাধিক্য। বিদায় দেবার সময় গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে ঠাকুরদা বল্লেন—"দিদি মনে রেখো, তুমি ফিরে না আসা অবধি বাড়ী অন্ধকার।"

শ্বশুর বাড়ী সেকেলে ধরণের। ওঁরা যে বিশেষ রকম টাকার মানুষ ওঁদের হালচাল থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার বসুবাগান লেনের ছ-খানি বাড়ী জুড়ে বাস করছে, সকলের রান্না খাওয়া এক জায়গাতেই। বিরাট রান্নাবাড়ীতে বাড়ীর মেয়েরা হাসিমুখে রাঁধুনি-চাকরাণীদের সঙ্গে সমানভাবে পরিশ্রম করে যায়। সারা বাড়ীটারই এই ধারা। আপন জন ছাড়া বাড়ীতে অনেক আশ্রিতও রয়েছে, খোঁজ নিয়ে জানতে পারা যায় না যে কে আশ্রিত আর কেই বা আশ্রয়দাতা। অশনে বসনে প্রভুভৃত্যে প্রভেদ কম। কালো কালো সিন্দুকে নিশ্চয়ই পুঁজি জড়ো করা আছে, তা সত্ত্বেও বাড়ীতে সম্পূর্ণ সাম্যবাদ!

দেখলাম বাপের বাড়ীর অনেকগুলি মেয়ের মধ্যে নিরু আদুরী মেয়ে। শুনলাম সে সুলক্ষণা, তার জন্মের সঙ্গে বিশেষ সৌভাগ্যোদয় হয়েছে। সে সেবাপরায়ণা, দয়াশীলা, নিরীহ। অভিমান ছাড়া তার স্বভাবে আর কোন খুঁৎ নেই।

সে বোধহয় আদুরী হবার জন্যই জন্মেছিল। পাঁচটার ঘরের মেয়ের এখানে খালি-খালি লাগবে মনে করে বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠে রেডিও, গ্রামফোন, চকচকে মলাটের বই, কাঁচের চৌবাচ্ছায় লাল নীল মাছ, পিতলের খাঁচায় ক্যানারী পাখী, নিত্য নূতন জিনিষের আমদানী করতে লাগলেন।

আমার কাছে কি নিরুর কোনও আদর ছিল না? শ্বশুর বাড়ী থেকে রাত্রিবাসের নিমন্ত্রণ পেলে পুলকিত হই। নিরুর হালকা নরম মসৃণ, সুরভিত দেহখানি কি উপেক্ষা করবার মত!

ভবিষ্যতে সুগৃহিণী হতে হবে, তাই তার জন্যে নূতন একখানি ভাঁড়ার ঘর দরকার। স্থির হোলো রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের ছাদে মার্ব্বেলের মেঝে, চারি দিকে জানালা, জানালার ফাঁকে ফাঁকে কাচ বসান দেওয়াল-আলমারি দেওয়া সুন্দর, বৃহৎ ভাঁড়ার ঘর তৈরী করিয়ে, একটি সুদৃশ্য সেতুর সাহায্যে দোতলার ভিতর দিকের বারান্দার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে।

তারপর ইঁট, চূণ, বালি, সুরকি ইত্যাদি জড়ো করে মহা আড়ম্বরে গৃহের শান্তিভঙ্গ করে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হয়ে গেল। ঘর তৈরী শেষ হলে বাবার বড়পিসি তাঁর পুরোন ঝি যুবনের মার বোন ভুবনের মাকে পাঠিয়ে দিলেন। সে ভাঁড়ার ঘরের জিনিষ পত্র ঝাড়াই বাছাই করে দিলে, মধুকাকা নতুন কেনা নানা আকারের জার ভর্ত্তি করে বাবার নির্দ্দেশ মত আলমারীতে সাজিয়ে রাখল। ভাঁড়ার ঘরের এক এক পাশে কাঠের সিংহাসনে শঙ্খ, ঘণ্টা, পুজোর বাসনের মধ্যে রবি-বর্ম্মার আঁকা লক্ষ্মীর ছবি, অন্যদিকে গ্যাসের উনুনের পাশে পাথরের নিচু বেঞ্চির উপর এলুমিনিয়ামের রান্না করবার ছোট ছোট বাসন।

অক্ষয় তৃতীয়ায় নিরুকে নিয়ে এলাম। পরদিন সকালে দেখলাম বাবা তাকে কাগজের খেলনা তৈরী করা শেখাচ্ছেন, বাবা যে এত রকম খেলনা তৈরী করতে জানেন তা জানা ছিল না। বৈকালে শুনলাম ঠাকুরদা নিরুকে কবিতা শেখাচ্ছেন, ঠাকুরদা ত চমৎকার আবৃত্তি করেন! নিরুকে সামনে বসিয়ে তিনি বোধহয় অদৃশ্য ক্ষীরোকে শোনাচ্ছেন—

"রাজপথ দিয়া আসিও না তুমি
পথ ভরিয়াছে আলোকে, প্রখর আলোকে।"

সন্ধ্যার পর একখানি সমস্যামূলক বইয়ে মনঃসংযোগ করছি, সাহিত্য সভার আগামী অধিবেশনে আলোচনা করতে হবে। চোখ তুলে দেখি দরজার কাছে নিরু দাঁড়িয়ে। তার পরণে নীলাম্বরী, সর্ব্বাঙ্গে গহনা, পায়ে আলতা, খোঁপায় বেল ফুলের মালা। আমার দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, নিরু কুণ্ঠিত স্বরে বল্লে—"দাদু পাঠিয়ে দিলেন জোর করে।"

মনের ভাব চেপে মিষ্টি করে বল্লাম—"তার জন্যে এত কৈফিয়ৎ কেন? তোমাকে এত সুন্দর সাজে দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম।"

শুনলাম ঠাকুরদা নিরুর জন্যে ঠাকুরমার তাবিজ, কঙ্কন, কণ্ঠমালা, ফুল ঝুমকো বার করে দিয়েছেন, তাঁরই পছন্দে নিরু নীলাম্বরী শাড়ী পরেছে। মালীকে দিয়ে ফুলের মালা আনিয়ে ভুবনের মাকে দিয়ে আলতা পরিয়ে তিনি নিরুকে সাজিয়েছেন।

শুনে বল্লাম—"ঠাকুরমার স্মৃতি বুকে নিয়ে ঠাকুরদা জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, তাঁর আশীর্ব্বাদে তুমিও সৌভাগ্যশালিনী হবে। এই সময়টা আমার লেখাপড়া করবার সময়। আমার সঙ্গে তুমিও লেখাপড়ার চর্চ্চা কর-না মণি।"

মণির মুখখানি শুকিয়ে গেল—"সেই সাধই যদি ছিল, তবে লেখা-পড়া জানা মেয়ে বিয়ে কল্লে না কেন ?"

"লেখাপড়া জানা মেয়েরা কি তোমার মত সুন্দর ? সুন্দর বৌয়ের আমার সাধ ছিল না বুঝি ?"

নিরু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। একটা বাংলা প্রবন্ধের বই নিয়ে পড়াতে বসলুম। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে মনে মনে ছটফট করতে লাগল। সেইসঙ্গে আমার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হোলো। ঠাকুরদার আদেশে সাজ গোজ করে প্রতি সন্ধ্যায় সে আমার কাছে আসে, ইচ্ছে হলে দু একটা কথা বলি, হাতের কাছে টুকিটাকি ফরমাস শোনবার লোক থাকায় আমার লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

সে 'সতীর সিন্দুর' 'পতির মর্য্যাদা' গোছের বই নিয়ে আমার কাছে বসে নিবিষ্ট মনে পড়াশোনা করে।

নিরু তার পঠিত উপন্যাসগুলির নায়িকাদের মত পতিবাক্য শিরোধার্য্য করবার মত মেয়ে নয়। গুরুজনদের উপদেশ সে মন দিয়ে গ্রহণ করে, বাবার ছোট পিসির আদেশে সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর লেপনে তার আপত্তি নেই। আমার সামনের দিকে একটু কম নামিয়ে চুল বাঁধার অনুরোধ সে রাখেনি। আমার কাছে সে একগুঁয়ে তার মতামত দৃঢ় সংস্কারে বদ্ধমূল।

তার জন্য আমার কিছু যায় আসে না। নিরুকে আমি অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখি। মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি থাকলে কি বিশ্লেষণ করা চলত ?

নিরুর কৃষ্ণনগরের কারিগরের হাতে-গড়া গতানুগতিক-ছাঁচে-ঢালা মুখে কোনও ভাব ফোটেনা। বড় ঠান্‌দির ছোট বৌমার অহঙ্কারে

মাটিতে পা পড়ে না, চেহারার সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্য হওয়ায় কমলা-কাকীমাকে রাণীর মত দেখায়। ছোট ঠান্‌দির বড় মেয়ে মনুপিসী ছটফটে বলে বকুনি খায়, চঞ্চলতাই তার সৌন্দর্য্যের বিকাশ। মেজ ঠান্‌দির নাতবৌমা অলকা-বৌদি ধীর স্থির প্রকৃতির মেয়ে, বুদ্ধিতে দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখখানির দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সেদিন জুতোর দোকানে বেঁটে-ছাতা হাতে যে দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে দেখেছিলাম, সে নিশ্চয়ই লড়িয়ে মেয়ে। নিরুর মধ্যে ভালমানুষ-ভালমানুষ ভাবটিও সুপরিস্ফুট নয়।

নারীজনোচিত সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আমার মনের ভাব নিরুর কাছে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। তার চাপা স্বভাব, বড় জ্যাঠা-মশায়ের বড় মেয়ে ছাড়া আর কারুর কাছে সে মনের ভাব প্রকাশ করে বলে না, মায়ের বয়সী এই বড়দিটিই তার একমাত্র সখী। বড়দি প্রায়ই আসেন, আমি পাশের ঘরে নিঃশব্দে ঢুকে বই হাতে নিয়ে বসে থাকি। চিরদিনই পরের কথা এইভাবে শোনা আমার নেশা।

শুনলাম বড়দি বলছেন—"আবার ঘ্যান্ ঘ্যানানি সুরু হোলো! পড়ে পড়ে অজয়ের মাথা খারাপ, সে একটু ক্যাঁট্‌ ক্যাঁট করে কথা বলে, তাই থেকে ধরে নিতে হবে যে সে তোকে ভালবাসে না? তোকে ভালবাসেনা ত কাকে ভালবাসে শুনি?"

নিরু গুণ-গুণ করে কি বল্‌লে শোনা গেল না, শুধু বোঝা গেল ধমক্ খেয়ে সে খুশী হয়েছে। বডদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার দাদাবাবু খুব ভালো! ঘর করে দেখনা দিনকতক!'

নিরু বল্‌লে—"তাহলে তোমাকে ত এখানে থাকতে হয়।"

"অজয় যদি রাজী হয়—আমার ত ভালই।"

বাবার আদেশে নিরুকে নিয়ে এখান-সেখান বেড়াতে যাই। পরিচিত লোকদের সঙ্গে দেখা হলে নিরুর গেঁয়ো চাল চলনের জন্যে লজ্জা করে, এড়াবার চেষ্টায় ফন্দী ফিকির করেও বেড়ানো বন্ধ করতে পারি নি। সিনেমা থিয়েটারে ভালো বই এলে বাবা সরকার মশাইকে দিয়ে দুখানি দামী টিকিট আনিয়ে রাখেন। উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে গেলাম। এক ধাপ্ উচ্চ শ্রেণীতে লাট সাহেব সপরিবারে বসে আছেন, লাটপত্নীর কালচে সবুজ রংয়ের পোষাক, ঠিক ঐ রংয়ের শাড়ী পরা ওপাশের সুন্দর মেয়েটি এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকবারই লক্ষ্য করেছি—আমার সুসজ্জিত সুন্দর চেহারা মেয়েদের উপেক্ষার বস্তু নয়। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল। অন্ধকারের মধ্যে লাটপত্নীর গলার হীরে ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে। ঐ মেয়েটির তাকানোর মধ্যে নূতনত্ব নেই।

'ইন্‌টারভ্যালে' আলো জ্বলতে সেই মেয়েটির দিকে তাকালাম, তার দৃষ্টিও আমার দিকে—মুখে হাসির আভাস, কালো স্যুট্‌পরা পাশের ভদ্রলোককে সে যেন আমার বিষয়ে কিছু বলছে। সে কি আমার পরিচিতদের মধ্যে কেউ ?

'শো' ভেঙে গেল। সজীব পুঁটুলিকে নিয়ে অপ্রসন্ন চিত্তে ভীড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। পিছনে মিহি গলায় কে যেন কাকে 'অজয়দা' বলে ডাকছে। পরমুহূর্ত্তে হাইহিল জুতো পায়ে সবুজ শাড়ীপরা মেয়েটি আমার সামনে এসে গেল, পিছনে কালো স্যুট্‌পরা ভদ্রলোক। মেয়েটি স্বপনের বোন জলি।

জলিকে দেখতে লাগলাম সাজসজ্জায় নিজে বেশি রকম সচেতন বোধ হয়। কাজ নেই, অপরের সজ্জার ত্রুটি বিচ্যুতিটি সহজেই চোখে পড়ে।

জলি এত সুন্দর রং মাখতে শিখেছে যে মেমেদের সঙ্গে তার রংয়ের যে কোন তারতম্য আছে তা ধরাই যায় না! ঠোঁটে কুসুমফুলি রং মাখা, মেমেদের মত ভুরুর টান, উপরন্তু চোখে সূক্ষ্ম কাজল রেখা, কপালে কুম্‌কুমের টীপ্‌ এটা মেমিগিরির বাইরে। জলির পেন্‌ডেণ্টের হীরে লাটপত্নীর হীরের চেয়ে হয়ত একটু কম ঝক্‌ঝকে, কিন্তু তার ছোট মুখখানির দুপাশে দুখানি হীরের বড় কানবালা সরু চেনকে অবলম্বন করে ঝুলছে, কানবালা দু'খানির দুলুনির বিরাম নেই। মণিবন্ধে হীরের ব্রেসলেট বগল্যাসের মত চেপে বসে আছে, তাতে জলির সরু হাত দুখানিকে কাঠির মত দেখাচ্ছে। কতকগুলি ঢিলে চুড়ি পরলে ঢের বেশি মানাত। হীরের আংটি দুটি চমৎকার।

জলি তার স্বামী মিষ্টার বাড়ুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে,আমিও নিরুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। জলি নিরুকে অবজ্ঞাভরে এক চোখে দেখে নিয়ে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, তার কথার বারো আনা ইংরিজী। মিষ্টার বাড়ুরি দাদার বন্ধুর ওপর সন্দেহ প্রকাশ করে রসিকতা করায়, জলির হাতের উদয়শঙ্করের চিত্র সংকলিত চটি বই-খানির প্রহার লাভ করলেন। জলি অনর্গল কথা বলছে, হাসছে, স্বামীকে মারছে, আমাব হাতেও দু'এক ঘা পড়ল। বেশ কৌতুক অনুভব করছি। আমার পর্য্যবেক্ষণশক্তি অসাধারণ। একসঙ্গে জলি, স্বামী, নিরু, জনতা সব কিছুকেই লক্ষ্য করছি।

নিরুকে অপরূপ দেখাচ্ছে, তার ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি জলির মুখের ওপর, কালো চোখ হীরের মত জ্বলছে, গালে স্বাভাবিক লালিমা। তার কাছ দিয়ে যাবার সময় জনতার গতি মন্দ হয়ে যাচ্ছে, মেয়েলি গলায়

কে একজন বল্ল—"মেজদি ছাখ ভাই, ওদিকে চকোলেট রংয়ের কাশীসিল্ক পরা বৌটা কি সুন্দর!" জলির স্বামীর জলি ছাড়া আর কোনও দিকে নজর নেই, জলি তাঁকে ঠুলি পরিয়েছে। পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম, গাড়ীতে উঠেই নিরু ফেটে পড়ল।

সে যে হিংসুটে, এটা আবিষ্কার হওয়ায় তাকে জলির নাম নিয়ে জ্বালাতন করে খেলা করবার সুযোগ পেলাম। আমি জানি তাকে দুটি মিষ্টি কথা বল্লে, একটু আদর কল্লে, সে সব ভুলে যাবে! আমার হাতেই তার জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি।

বৈশাখের সন্ধ্যা। আকাশে পাতলা মেঘ, চিক্‌মিকে বিদ্যুৎ। গুমোট ভাবটা কাটিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে স্বরু হোল। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে বর্ষাতি-কোট কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, আমার একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্য।

দুখানি গাড়ীর মধ্যে একখানি অচল অবস্থায় গ্যারেজে বন্ধ। ঠাকুরদার চোখে ছানি পড়েচে, বই পড়া চলে না—অবশিষ্ট গাড়িখানি সন্ধ্যায় তাঁর নিজের ব্যবহারে লাগে, তাই ট্রামে আর আগের মত আপত্তি নেই। বাবার ইচ্ছা আমাদের জন্য আর একটা গাড়ী হয়, তাতে ঠাকুরদার আপত্তি। নিরুর প্রতি তাঁর ভালবাসায় ভাটা পড়ে গেছে, নিরুর চাল বেড়ে গেলে টাল সামলান মুস্কিল হবে। বাপের বাড়ীর স্থখ স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় সে রাণীর হালে রয়েছে, তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার কি দরকার?

ক্ষীরোদার অবস্থা কল্পনা করি, বড সম্পর্কীয়দের বাদ দিলে স্নেহ, প্রেম সকল ক্ষেত্রেই ঠাকুবদা এক রকমই।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পডছে। আমার পাশেরটি ছাড়া গাড়ীর আর সব জানালা বন্ধ। গাডীর মধ্যে আমি ছাড়া আর একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গায়ে ভিজে জামা, মুখে বিরক্তি। একদল তরুণ তরুণী হুড়মুড় করে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারা চিৎকার করে হাসছে, নিঃসঙ্কোচে কথা বলছে, ট্রামগাড়ী যেন তাদের ঘর বাড়ী। রাস্তায় জল জমে গেল। আব্‌ছা চাঁদের আলোয় রাস্তাকে নদী বলে ভ্রম

হচ্ছে। জনবিরল পথে টুং টুং করে রিক্সা ছুটছে, বিদ্যুতের আলোয় চকিতের জন্য পর্দ্দানশীনের ভারী জুতো পরা মোটা মোটা পা দুখানি দেখা গেল। ট্রামগাড়ী দেশীপাড়া সাহেবপাড়া অফিসপাড়া ঘুরে আমাদের রাস্তার সামনে থামলো।

বৃষ্টি নেমে গেছে। পায়ের তলায় জলে ধোওয়া কালো কুচ্‌কুচে রাস্তা। গাছের ওপরের জমা জল টপ্ টপ্ করে কোটের ওপরে ঝরে পড়ল। মেঘ কেটে যাচ্ছে, আকাশে ঝক্‌ঝকে পূর্ণশশী। সন্ধ্যার পর আমাদের রাস্তায় লোক চলাচল বিরল থাকে, আজ দৃষ্টিপথের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার আপাদমস্তক কালো পোষাকে ঢাকা, পায়ে রবারের জুতো, আমি যেন ছোট-বেলায়-পড়া গল্পের বইয়ের গোয়েন্দা কিম্বা অপরাধী।

খিড়কির দরজা খোলা। রান্নাঘরে হরির উত্তেজিত স্বর শুনতে পেলাম। মধুকাকা পেনসেন নিয়ে দেশে চলে যাওয়ায় ঠাকুরই চাকরদের সর্দ্দার, ঠাকুর হরিকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে—"বাহাত্তরে বুড়োর ভীমরতি ধরেছে, তার কথায় তোর কান দেওয়ার কি দরকার! মেজবাবু ত কিছু বলে না।" আমাকে তারা দেখতে পায়নি। বারান্দায় আসতে আসতে ঠাকুরদার গলা শুনলাম, এই সময়টা নিরু ঠাকুরদার ঘরে থাকে, অভ্যাস অনুযায়ী জানলার কাছে সরে এসে শুনলাম—"সাধ করে অজু তোমাকে পছন্দ করে না, তুমি কি এ বাড়ীর বৌ হবার যোগ্য! সংসারে এত অপচয় হচ্ছে, কি কর্ত্তে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে ঝুলিয়েছ!"

আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে কথা ঠাকুরদার বলা শোভা পায় না। আমার স্ত্রীর অপমানে আমারই অপমান! উপরে উঠে বারান্দার

আলো জ্বেলে দিলাম। সাম্‌নের পাঁচিলের ওপর জালের বেড়া, বেড়ার গায়ে শুধু মালতীলতা, তীব্র আলোয় ফুলগুলি ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। এই আলো আমার বাড়ী ফেরবার সঙ্কেত, একটু পরেই নিরু আসবে। খাটের কাছে তেপায়ার ওপর ছাই ফেলার ট্রেটি ঝকঝক করে জ্বলছে, রূপোর রেকাবীতে বেলফুল, ফরসা, পাতলা, সাদা ন্যাকড়া জড়ানো ছোট ছোট পানের খিলি। নিরু সেবা করতে জানে, আজ-কাল স্নানের টবে বরফ ভাসে। নিরুকে শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে, ঠাকুরদার কোপ দৃষ্টিই তার কারণ।

নিঃশব্দচারিণী নিরু এসে পাশে শুয়ে পড়তে চম্‌কে উঠলাম, চাঁদের আলোয় দেখলাম নিরুর মুখে রাগ বা দুঃখের চিহ্ন নেই, বেচারী চাপা মেয়ে! সস্নেহে বললাম—"নিরু, ঠাকুরদা আজকাল বড্ড খিট্‌খিটে হয়েছেন নয়?"

"কৈ না ত! কে বল্লে?"

"চাকররা বলাবলি করছিল, বুড়োর ভীমরতি হ'য়েছে।"

"ভারী স্পর্দ্ধা ত! তুমি শুনে কিছু বল্লে না?"

মনের ভিজে ভাবটা কেটে গেল, শুক্‌নো গলায় বল্লাম—"তাদের ওপর দুর্ব্যবহার হলে তারা বলবে না?"

"সাম্‌নে বলে না কেন? আড়ালে আলোচনা কি ভাল?"

মনে মনে মোক্ষম রকম উত্তর গুছিয়ে নিচ্ছি,—হঠাৎ মনে হলো বেচারী নিরু একটু আগে অপমানিত হয়ে আমার কাছে এসেছে, তাকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। সহানুভূতিতে মন ভরে গেল। কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বল্লাম—"তুমি আমাকে সব কথা গোপন কর কেন?"

আমার বুকে মুখ লুকিয়ে নিরু উত্তর দিলে—"আমার লজ্জা করে না বুঝি! তাছাড়া, বাবা বল্লেন আমার রকম-সকম দেখে সন্দেহ হলেও এ মাসটা না গেলে কিছু বলা যায় না, ছোট ঠানদিরও তাই মত।"

বাবার খাবার দেওয়া হচ্ছে সেই ছুতোয় নিরু আমার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

রাত্রি দেড়টা। তেপায়ার ওপর শেড্ দেওয়া আলো, আজ আর অন্য দিনের মত পড়ায় মন নেই। একটু আগে নিরুর সঙ্গে যা কথা হ'য়েছিল তাই নিয়ে মনে মনে আলোচেনা করছি। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কি দরকার! আমার বুদ্ধির ওপর নিরুর আস্থা নেই, আমি ভাল করতে গিয়ে মন্দ করে বসব। প্রতিকার বাবার হাতে, তিনি উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করছেন।

আমি অন্যরকম হলে সে সুখী হোতো কি না জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছিলুম, আমাকে সে অন্যরকম ভাবতেই পারে না। তার সুখ? সব সুখ সকলের কপালে হয় না ভেবে নিলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

নিরু পৃথিবীর মানুষ! আকাশ সম্বন্ধে তার ধারণা নেই, কৌতূহল নেই, এমন কি আকাশ সম্বন্ধে তার অশ্রদ্ধার ভাব আছে।

প্রবীর প্রেমে পড়েছে, তারা একস্তরের মানুষ, তাদের প্রেম শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার কথা মনে হলে নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়।

নিরুর দিকে চেয়ে দেখলাম, সে রূপকথার রাজকন্যার মত সুন্দর ভঙ্গীতে ঘুমোচ্ছে, নিশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা যায় না, তার ঘুমটি সুন্দর। আমার ছেলে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে, বুড়ো হবার আগেই আমার উপযুক্ত ছেলে আমার সহায় হবে। বাবার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা

নেই। আমার মনে যেমন অভাব বোধ আছে আমার ছেলের তেমন হতে পারে না। ছেলের সঙ্গে আমি বন্ধুর মত ব্যবহার করবো।

পরদিন অফিসে গিয়ে দেখি অফিস সরগরম। কেউ কাজ করছে না, সকলে জটলা করে হাসাহাসি করছে। দয়ালবাবুর ছেলে এম-এ পাশ করে বসে, কোথাও চাকরী খালি নেই। অন্যতম কর্ম্মচারী নন্দবাবুর বি-এ পাশ ছেলেকে আমরা চাকরী দিয়েছি, তখন যে একটা চাকরী খালি ছিল, এ কথা দয়ালবাবু বুঝেও বুঝতে চান না, ভাবে ভঙ্গীতে অভিমান প্রকাশ করেন। টাকার অভাবে নন্দবাবুর বিবাহ-যোগ্যা সুশ্রী মেয়েটিকে পার করা যাচ্ছে না। আজ সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। আসছে মাসের পয়লায় দয়ালবাবুর ছেলে চাকরী পাবে, বিনিময়ে নন্দবাবুর মেয়েকে দয়ালবাবু পুত্রবধূ করবেন।

অফিসের মধ্যে আমার কামরাখানি নির্জন, দয়ালবাবুকে আমার কামরায় ডেকে এনে বাবা বল্লেন—"আপনি আচ্ছা বোকা ত? আপনার না হয় দাবী দাওয়া নেই, বৌদির ত একটা সাধ-আহ্লাদ আছে, সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, ঐ একমাত্র ছেলে। অমন ছেলে পাচ্ছে—নন্দ অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করুক। ইন্সিওরেন্সে দুই হাজার আছে, বাকি তিন হাজার আমি ধার দিচ্ছি। নন্দরও ত এই শেষ মেয়ে, নন্দর গিন্নি মরে ভূত হ'য়ে গেছে, আর মেয়ে হবার সম্ভাবনাও নাই। নন্দ বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী হলে দেড়শ'র জায়গায় তার আড়াইশ' টাকা মাইনে হবে, বাড়তি টাকাটা মাসে মাসে ফেলে দিলে আড়াই বছরেই দেনা পরিষ্কার।"

খানিক পরে নন্দবাবুকে টান্তে টান্তে নিয়ে এসে বললেন, —"তোমার সুশ্রী মেয়েটির বিয়ে হ'য়ে গেল, তাতে আমি কি করলাম!

আমার ওপর গদগদ হয়ে উঠলে কেন? এখন কাজের কথা হোক্, দয়াল লোকটা নামেও যেমন কাজেও তেমনি। শুনেছি দয়াল-গিন্নি ভারী দজ্জাল, কিন্তু তার জন্যে তোমার চিন্তা করবার দরকার নেই। দয়ালের পিসতুতো শালার মনিহারী দোকান থেকে আমরা জিনিষ কিনি, কায়দা করে মাগীকে জানিয়ে দোব, আমার ভাইঝির ওপর দাজ্জালিগিরি ফলাতে গেলে, ছেলেরও চাকরীতে উন্নতির দফা ইতি হ'য়ে যাবে।"

সন্ধ্যায় বাবা সবিনয়ে ঠাকুরদাকে জানালেন, তাঁর একটি প্রস্তাব আছে। ঠাকুরদার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে তিনি জানালেন—"ডাক্তার সাতকড়ির মামাশ্বশুরকে চোখের কাজ করতে নিষেধ করায়, তিনি সব সময়ের জন্যে একজন লেখাপড়া জানা লোক নিযুক্ত করেছেন। আপনার জন্যেও সেইরকম একটি লোক খোঁজ করা যাক। তার আনাগোনার জন্যে সামনের বারান্দার পাশ দিয়ে একটি খোলা সিঁড়ি তৈরী করিয়ে দিলে বাড়ীর আব্রুও বজায় থাকবে। নন্দবাবু মানে সেই লোকটির শোবার জন্য লাইব্রেরী ঘরে আর একখানা চৌকী—"

ঠাকুরদা প্রশ্ন কল্লেন—"কে নন্দবাবু?"

"নন্দবাবু? নন্দবাবু মানে সেই যে নন্দবাবু" বলতে বলতে বাবা সামলে গিয়ে সোজা হয়ে বসে বল্লেন—"আমাদের অফিসের সেই যে নন্দবাবু, যার লেখা প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় পড়ে ভালো বলেছিলেন, তাকে একবার বলে দেখব কি? একটু বেশি টাকা দিলে সে বোধহয় রাজি হয়ে যাবে, লোকটার টাকার দরকার, শুনছি মেয়ের বিয়ের জন্যে দেনা টেনা কি সব করতে যাচ্ছে।"

ঠাকুরদার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বল্লেন—"চিনির বলদের মত এতদিন বহন করেই গেলাম, এইবার একটু খরচ করি নিজের জন্যে। দেখ, ওঠানামা করতে আমার একটু কষ্ট হয়, বাগানের মধ্যে আমার জন্য একখানা ঘর তৈরী করিয়ে দাও, পাশে নন্দবাবুর জন্যেও একটি ছোটঘর—"

"সেই যখন করানই হচ্ছে তখন ভালো করে একটা বাংলো করান চার পাঁচখানা কামরা থাকবে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় বাড়ীতে চ্যাঁ-ভ্যাঁ স্থরু হয়ে গেলে আমিও নিরিবিলিতে আপনার সঙ্গে থাকব। আর দেখুন ইচ্ছেমত বেড়াতে যাওয়ার জন্যে আমাদের আলাদা একটা গাড়ী চাই।"

ঠাকুরদাকে শিশুর মত নির্ভরশীল দেখাচ্ছে। বাবা সগৌরবে অথচ বিনা আড়ম্বরে গৃহকর্ত্তার আসন অধিকার করে বসলেন।

আফিস থেকে ফিরলাম। বাগানে ডাক্তারের গাড়ী! কি হোলো হঠাৎ? নিরুর সন্তান সম্ভাবনা, কিন্তু তার ত' এখনও দেরী আছে। ঠাকুরদা স্থায়ী রোগী। চিকিৎসকরা বাবার সম্বন্ধে শঙ্কা পোষণ করেন। তাহলে ডাক্তার কার জন্যে?

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বাবাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। তিনি চাকরদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন প্রচুর পরিমাণে গরম জল প্রস্তুত করে রাখে। মাথায় রুমাল বাঁধা একটি মহিলা সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছেন, হরি তাঁর হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল। বোধ হয় ভয়ের কারণ নেই, তা হলে বাবার মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন থাকত। মনের মধ্যে সঙ্কোচের ভাব অনুভব করে ওপরে উঠে এলাম। ছোট-ঠানদির আসবার কথা ছিল, হরিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে জ্বর হওয়ায় তিনি আসতে পারেন নি। কাল ভুবনের মা ভবানীপুরে চলে গেছে তার মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে। এরকম সহায়হীন অবস্থায় আমার মাথা খারাপ হ'য়ে যেত, কিন্তু বাবা দমবার ছেলে নয়।

সামনের বারান্দায় ঝিয়ের কোলে আমার মেয়েটি। পরশুদিন তার প্রথম জন্মদিনের উৎসব সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। আজ তার চুল আঁচড়ান হয়নি; বিষণ্ণ মুখের ওপর সোনালি কোঁকড়া চুল, গায়ে ফিকে নীল রংয়ের গরম জামা, জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমিই কিনে এনেছি। মেয়েটিকে ছবির মত দেখতে। হু হু করে শীতের হাওয়া

বইছে। জামাটা যথেষ্ট গরম নয়, একটা মোটা কোট হাতে নিয়ে তার কাছে যেতে সে দু'হাত বাড়িয়ে আমার কোলে চলে এল। বাবার আদরের লাল টুনী, অন্যদিন সে আমাকে আমল দেয় না। তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম, এখনও কথা বলতে হাঁটতে শেখেনি, এরি মধ্যে তার মার কোলে ভাগীদার!

নীচে বাবার গলার আওয়াজ পাচ্ছি, তিনি পরম উৎসাহে ছুটোছুটি করছেন। ঠাকুরদা নবনির্ম্মিত বাংলোয় চলে যাওয়ায় আমাদের মাথার ওপর চাপ নেই, বাবার চিৎকার করে চাকরদের ডাকেন, আমি যখন তখন নিরুকে ডেকে পাঠাই। নিরু কন্‌কনে সরু গলায় বাবার সঙ্গে গল্প করে, আব্দার করে, ঝগড়া করে। ঠাকুরদাকে বাগানের মধ্যে বনবাস দিয়ে আমরা স্বাধীন হবার সুযোগ পেয়েছি।

হঠাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ সুরু হয়ে গেল। বাবার হাসির আড়ালে নিরুৎসাহের ভাব উঁকি দিচ্ছে। কুয়াসাচ্ছন্ন সান্ধ্য আকাশের দিকে চেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল, আবার একটি মেয়ে। ডাক্তার চলে গেলে নার্সের কাছ থেকে খবর এলো প্রসূতি কান্নাকাটি করছেন, তাঁকে অবিলম্বে সান্ত্বনা দেওয়া দরকাব। বাবা ব্যস্ত হয়ে আঁতুড় ঘরে ঢুকলেন। ঠাকুরদার পুরোন ঘরখানা আজকাল আঁতুড় ঘর!

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। পা টিপে টিপে সামনের বারান্দায় দাঁড়ালুম। বাবা বলছেন—"পাগলী বেটি, মেয়ে হ'য়েছে বলে কান্না জুড়েছ? এতে তোমার মেয়ের অকল্যাণ হবে না? কান্না থামিয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে দেখ দেখি। এ মেয়ে দেখছি লাল টুনির চেয়েও সুন্দরী হ্য়েছে! কি নাম রাখা যায় এর? লালটুনির সঙ্গে মিল করে মৌটুসী রাখব কি? টিয়া নামটাও বেশ মানাবে, কেমন লালটুকটুকে ঠোঁট—"

"আর মিলে কাজ নেই। শেষে দেখবেন পাখীতে পাখীতে ঘর ছেয়ে যাবে—"

—"আবার সুরু হলো! আমার ঘর যদি পাখীতে ছেয়ে যায়—তোমার বাবার কি? তোমার ফুলের মতন মেয়েটি--নাম আমি ফুলটি রাখলাম, এবার ত আপত্তি নেই?"

"আমার বাবার আটটা মেয়ে—তাঁর সয়ে গেছে। আপনার বাবা ফুলটির খবর পেয়েছেন?"

—"তা পেয়েছেন। আমার মনে একটা মতলব এসেছে। নন্দর বন্ধুরা এলে বাবা খুশী হন, নন্দকে বলেছি, তার বন্ধুবান্ধবদের ভুলিয়ে এনে বাবার খর্পরে ফেলে দিতে। নতুন বাংলোয় চা জলখাবার আর অন্য সব রকম আরামের সুবন্দোবস্ত করে রাখব, যাকে বলে মায়াজাল বিস্তার! আঁতুড় ওঠবার আগেই আড্ডা জমে যাবে, তারপর একদিন কায়দা করে বলব, বাংলোয় নানান রকমের লোক আসছে এখানে আমার নিরুমা আসবে না। বাবা আব্রু ভালবাসেন। শুনে আমার উপর খুশী হবেন, তুমিও মেয়ে হওয়ার বকুনি খাওয়া থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।"

নার্স ঘরে ঢুকে বল্লে—"এত হাসাবেন না, তা হলে ওঁর ক্ষতি হতে পারে।"

"একটু আগে যে বল্লে মা কান্না খারাপ, এখন বলছ হাসি খারাপ, বুড়ো মানুষ, তোমাদের আজকালকার ছেলেমেয়েদের বুঝতে পারি না, পালাই।"

নার্সের হাসি শোনা গেল—"চমৎকার লোক! ফুলবনে বসে তপস্যা করে বুঝি এমন শ্বশুর পেয়েছেন!"

কিছুদিন যেতে না যেতে ফুলটি শুকিয়ে যেতে লাগল, তার মার বুকে দুধ নেই। বড়-মেয়ে লালটুনি হলদে-টুনি হয়ে গেল, ঠানদিরা বল্লেন তার দৃষ্টি-এঁড়ে লেগেছে। নিরু বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগল। ডাক্তাররা বলেন 'এনিমিয়া', ঠানদিদিব মতে "শুকনো সূতিকা"।

দুজন অভিজ্ঞ ধাত্রী নিযুক্ত করে বড় বড় ডাক্তার এনে চিকিৎসা চলতে লাগল। বাবার পিসিমারা পালা করে আসেন। একটু সারলে সকলকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাওয়া হবে। ঠাকুরদার শরীর খারাপ হওয়ায় বাবা টেবল্‌টেনিস বলের মত ওপরে নীচে ছুটোছুটি করে বেড়ান। নিরু রাগ করে—"আপনার বাবাকে দেখে শিখুন কি করে শরীরের যত্ন করতে হয়—"

—"কেমন স্বীকার করতে হোলো ত, তোমার শাশুড়ির শ্বশুর, তোমাব শ্বশুরের চেয়ে অন্ততঃ একটা বিষয়ে ভালো?"

"হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না, আমি বস্থ বাগান লেনে চলে যাব।"

—"তা হলে ছুটোছুটিটা বসুবাগান লেন অবধি চলবে। সেই হরিঘোষের গোয়ালে আর যাই হোক্ চিকিৎসা হয় না।"

—"তাঁরা আপনাদের চিকিৎসার ঘটা দেখে হাসাহাসি করেন। খাওয়া-ছোঁয়ার অনেক বাছ-বিচার করতে হয়, আপনাদের এখানে তার সুবিধে নেই, নইলে একটা মাদুলি পরে' কোন্‌দিন সেরে যেতাম।"

বাবার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে! তাঁকে অফিসে যেতে বারণ করলাম কিছুতেই রাজী হলেন না "কোনও কাজ কর্ম্ম ত করি না। স্রেফ্ আড্ডা দিই, মনটা ভালো থাকে—বন্ধুরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, সব

সময় ট্রামে চড়ে ট্যাং ট্যাং করে আসতে পারেন না। আমার গাড়ী আছে, অফিস থেকে তাঁদের কাছে যাই !"

আসল কথা হৃদয় ময়রার লেন। পৃথিবী উল্টে গেলেও তাঁর সেখানে যাওয়া চাই। হাওয়া বদলাতে অবশ্য যাবার ইচ্ছে আছে— "বাবাকে রাজী করাও, তাঁর দরকার। তোমরা মধুপুরে যাও, ছোট পিসি তোমাদের সঙ্গে যাবেন। আমি বাবাকে নিয়ে পুরী কি অন্য কোথাও যাই।"

কিন্তু ঠাকুরদা হাওয়া বদলাতে রাজী নন—"অক্ষয়কে জোর করে নিয়ে যাও। আমাকে ধরাধরি করে ট্রেনে ওঠাবে সেটা ভাবতে খারাপ লাগে। নন্দবাবু রয়েছেন আমার কোনও অসুবিধে নেই।"

বাবা শুনে আমাকে সেখানে বল্লেন"—উনি যে-কোন সময় মারা যেতে পারেন, হার্টের অবস্থা এতই খারাপ। এ সময় ওঁকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। ডাক্তার যদি আমার হাওয়া বদলানোর ওপর জোর দিত তা হলে আলাদা কথা ছিল।"

প্রকাণ্ড একটি দল নিয়ে চলে গেলাম। —"ডাক্তারের হাওয়া বদলানোর নির্দ্দেশে মাস দশেক পরে যখন ফিরে এলাম তখন তখন রোগীরা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। ফিরে আসার তিনদিন পরে বাবা অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন, এই তাঁর তৃতীয় বারের আক্রমণ।

শুক্লপক্ষের রাত্রি। বাগানে সারি সারি মোটর দাঁড়িয়ে ডাক্তারদের, আত্মীয়-স্বজনদের। বাংলোর বারান্দায় নন্দবাবুকে পাশে নিয়ে ঠাকুরদা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন। মধ্যরাত্রে বাবার হৃদ্‌যন্ত্র নিশ্চল হ'য়ে গেল।

নন্দবাবুকে অবলম্বন করে ঠাকুরদা ওপরে উঠে এলেন। ধীরভাবে বল্লেন "ভোর বেলায় রওনা করিও, গায়ে যেন রোদের আঁচ না লাগে।" বোনেদের উদ্দেশ্যে বল্লেন—"অক্ষয়কে বিয়ের লাল বেনারসী-জোড় পরিয়ে সাজিয়ে দাও।" চন্দন, ফুলের মালা নিজেই পরিয়ে দিলেন, তাঁর হাত কাঁপছিল, তাঁকে ওপরে থাকতে অনুরোধ করলাম, রাজী হলেন না। বাবাকে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে দোতলা থেকে তিনিও নেমে গেলেন।

লোকে মনে করেছিল এ আঘাতে ঠাকুরদা তৎক্ষণাৎ মারা যাবেন। বছর ঘুরে গেল, পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধ বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বেঁচে রইলেন। সারাদিন তাঁর কাছেই থাকব শুনে ঠাকুরদা বল্লেন—"না, না, তা হলে আমার অশান্তি হবে। নন্দবাবু ত রয়েছেন, চমৎকার লোক, অনেকটা তার মত।" বলেই আমার ডান হাত নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরলেন, তাঁর চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঠাকুরদার স্বভাবের এতটা মাধুর্য্য কোথায় চাপা ছিল! তিনি একেবারে বদলে গেলেন। একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখি আমার জ্যাঠশ্বশুর ঠকুরদার পদসেবা করছেন। এ ধরণের সেবা নিতে ঠাকুরদাকে ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। আমাকে দেখে ঠাকুরদা খিল খিল করে হেসে উঠলেন—"তোমার জ্যাঠশ্বশুর নাছোড়বান্দা, তাছাড়া আমি বুড়ো মানুষ ওঁর সঙ্গে জোর করে পেরে উঠব কেমন করে?" জ্যাঠশ্বশুরের টাক মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন—"তোমার সেবা বড় মিষ্টি লাগল। যাও বাবা মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ কর, আমাকে আর সংসারের মধ্যে কেন?"

টাকমাথা ভুঁড়িওয়ালা, খোঁচা খোঁচা গোঁপ, তেলচিটে জামা পরা জ্যাঠ্‌শ্বশুরকে বাগানের অজস্র ফুলের মধ্যে সুরভিত পরিবেশে অত্যন্ত বেমানান দেখাচ্ছে। তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন—"আহা ওঁকে দেখলে কষ্ট হয়। নিজের হাতে ত নয়, নইলে কোন্ দিন চলে যেতেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। তোমাদের ঠাকুমা বলে পাঠালেন—আসছে মাসটা জোড়া মাস, তার পরের মাসটা চৈত্রমাস, তার পরের মাসে আটে পড়বে, গাড়ী চড়া বারণ—কথায় বলে আটে কাঠে উঠতে নেই। আমরা আবার ওই সব খুব মানি কিনা। তার পরের মাস জ্যৈষ্ঠ মাস, জ্যেষ্ঠ ছেলের বউকে কোথাও যেতে নেই—যদিও অভাব পক্ষে তের দিন বাদ দিয়ে যাওয়ার বিধান আছে, কিন্তু নিরুর যে ন'মাস পেরোয় না। ঘরে মরণাপন্ন রোগী, শেষ কালে নিরুকে নিয়ে তুমি বিব্রত হয়ে পড়বে। আমি বলি কি পরশু দিনে মহেন্দ্রযোগ আছে, সেই দিনে আমরা ওকে নিয়ে যাই। নিরুর জন্যে ত' কোনও দিন কিছু ভাবতে হয়নি। একাধারে শ্বশুর-শাশুড়ী বাপ-মা সবই পেয়েছিল। যাবার বয়েসও ত হয় নি। সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।"

মরণ কালে ঠাকুরদা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হাজার পঁচিশেক টাকা দান করে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আত্মশ্রাদ্ধ বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন করলাম, ঠাকুরদার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের অবসান হয়ে গেল। যদি আত্মার কোনও অস্তিত্ব থাকে, যদি প্রার্থনার কোনও মূল্য থাকে, প্রার্থনা করি ঠাকুরদার আত্মা শান্তি লাভ করুক। আমার ছেলে হওয়ার খবর তিনি পেয়ে গেলেন, বংশরক্ষা সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল; শেষকালে নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তিতে চোখ বুজলেন।

বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আমাকে পরিশ্রম করতে হবে না। ঠাকুরদা সমস্ত গুছিয়ে রেখেছেন। কর্মচারীদের দ্বারাই আজকাল অফিস চলে, মাঝে মাঝে সামান্য একটু দেখা-শোনা করবার প্রয়োজন হয় মাত্র।

একটি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করবার ইচ্ছাকে ঠাকুরদা আমল দেন নি। মারা যাবার দুদিন আগে নন্দবাবুর অসাক্ষাতে আমাকে বললেন—"দেখ ভেবে দেখলাম, সেই মাসিক পত্রিকা বার হ'লে নন্দবাবু, নতুন বাংলো দুয়েরই সুব্যবস্থা হবে। পাকা লোক সে, তোমার কাগজ বেশ ভাল ভাবেই চালাতে পারবে। বড্ড আত্মসম্মানী, নইলে কিছু দিয়ে যেতাম। তার সংসার সুখের নয়। এখানে শান্তিতে ছিল। নন্দকে তোমাদের পরিবারভুক্ত করে রাখলে তোমাদেরও লাভ আছে। নিরু বড় ঘরের মেয়ে, তাকে দিয়ে নন্দর অসম্মান হবার ভয় নেই।"

নিরুর সঙ্গে দেড়মাস দেখা সাক্ষাৎ নেই। ওঁদের বাড়ীতে আঁতুড় ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা—অশৌচের মধ্যে পুত্রমুখদর্শন নিষেধ। মেয়ে

দুটি ভুবনের মার সঙ্গে আনাগোনা করে, মামার বাড়ীতে তাদের গরম লাগে। ভুবনের মার হাতে নিরুর চিঠি পেলাম—"কাল ষষ্ঠীপুজা উপলক্ষে তোমার নিমন্ত্রণ হবে। কাজের ছুতো করে সকালে না এসে দুপুরে এস। সকালে এলে এঁরা তোমাকে ছেলে দেখিয়েই বিদায় করে দেবেন, আমার সঙ্গেও যে দেখা হওয়া দরকার সেটা এঁদের মাথায় ঢুকবে না। পুরোন বাড়ীর দোতলার কোণের ঘরে আমি থাকি। মেয়েরা কাল ওখানেই থাকুক, তাদের সঙ্গে এনো না, তাহলে কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে না।"

পরদিন সকালে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ পেয়ে গ্রহণ করলাম না। নিমন্ত্রণকর্ত্তার গলার আওয়াজে স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাড়াতাড়ি স্নান আহার সেরে অফিস গেলাম, সেখান থেকে 'হোয়াইট্ওয়ে'—সেখানে শিশুর ব্যবহাব উপযোগী কতকগুলি জিনিষ-পত্র কিনে শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করলাম।

শ্বশুর বাড়ীর গলিতে গাড়ী ঢোকেনা। বন্ধ গলির শেষপ্রান্তে পুরোন-বাড়ী, তার পাশেই নতুন বাড়ী। নতুন-বাড়ীর নতুনত্ব অনেক দিন আগে ঘুচে গেছে। গলির মধ্যে মেজো-বাড়ী, সেজো-বাড়ী, মেস-বাড়ী, পদ্ম-বাড়ী নামে শ্বশুরদের আরও চারখানি বাড়ী। বাড়ী-গুলির নামকরণের ইতিহাস আছে। মেজো বাড়ীতে যারা বাস করে তাদের মধ্যে যেমন মেজোবাবু বয়োজ্যেষ্ঠ, সেজবাড়ীতে তেমনি সেজোবাবু। মেসবাড়ীর একতলায় বৈঠকখানা, দোতলায় বাড়ীর অবিবাহিত ছেলেদের থাকবার আস্তানা। পদ্মবাড়ী মেজোবাবুর বড় ছেলে পদ্মকুমারের বিয়ের সময় তৈরী হয়েছিল, সেই থেকে বাড়ীর লোকেদের মুখে মুখে বাড়ীর নাম পদ্মবাড়ী হয়ে গেছে।

পুরোন বাড়ীকে সম্প্রতি চূনকাম করানো হ'য়েছে ; হলুদ প্রলেপে বাড়ীর জীর্ণতা ঢাকা সম্ভব হয়নি, বাড়ীর গায়ে গ্যাসের আলো। পুরুষ মানুষরা কাজের মানুষ, দুপুরে বাড়ী থাকেন না। উঠানের ওপাশে রান্নাঘর। ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিন খাওয়ার পাট সকাল সকাল চুকে যায়। রান্নাবাড়ীতে ঝিয়েরা বাসন মাজতে ব্যস্ত, রাঁধুনীরা চুল মেলে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করতে করতে বিশ্রামসুখ উপভোগ করছে। একদল ছোট মেয়ে শাড়ী পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে খেলা করছে। বাড়ীর নিয়ম অনুসারে এরা স্কুলে যায় না, সন্ধ্যায় পণ্ডিত মশাই আসেন। চিঠি লেখবাব মত বিদ্যা হলেই অভিভাবকরা সন্তুষ্ট হন। একটি ছোট মেয়ে মিনতি করছে—"বড় বামুন মা, একটু হলুদ দিতে বলুন না। দেখছেন না আমাদের তরকারীটা কি রকম বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।"

দোতলায় সিঁড়ির সামনে বড ঘরখানি আমার ঠাকুরমা-শাশুডীব। ঘরের দরজা খোলা, জানালাগুলি বন্ধ, পাখা বন্ বন্ করে ঘুবছে। বিদেশ থেকে আত্মীয়স্বজন এলে এই ঘরের মেজেতে নবাগতদের বিছানা পাতা হয়। চৌকীর ওপর ঠাকুবমা-শাশুড়ীর সরু সরু পা দুখানি দেখা যাচ্ছে। মাটিতে বড জ্যাঠ্শাশুড়ীর কাছে আমার শাশুড়ী নিজের খোকাটিকে বুকের কাছে নিয়ে ঘুমোচ্ছেন। মেয়ে আঁতুড়ে ঢোকবার কিছুদিন আগে তিনি আঁতুড থেকে বেরিয়েছেন। খোকার কাঁথায় কি সব লেখা রয়েছে। খোকাটি অনেক যাগযজ্ঞের ফল, তাই তার গলার সোনার হারে পাঁচ ছ'টি মাদুলি। আমার শাশুড়ীকে ছেলেমানুষের মত দেখতে, মেয়েরা মায়ের রূপ পেয়েছে। ঘরের মেজেয় অনেকেই গড়াগড়ি দিচ্ছেন। একটি ছোট বৌ জানলার ওপর বসে বই পড়ছে,

ঘরের প্রাণীগুলির মধ্যে সে-ই একমাত্র জাগ্রত প্রাণী। পাখার খরচ বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ছারপোকার মত সকলের এক জায়গায় জড়ো হওয়া।

কোণের ঘরের দরজার ফাঁক থেকে নিরুর হাসিমুখখানি দেখা গেল। খাটের ওপর নীল রবার ক্লথের ওপর নিরুর খোকা ঘুমোচ্ছে আনীত জিনিষগুলি দেখতে দেখতে নিরু প্রশ্ন করলে—"সকলে ঘুমোচ্ছে? কেউ দেখতে পায়নি?"

—"শুধু একটা বৌ জেগে আছে, বোধহয় ভানুর বৌ—সেও আমাকে দেখতে পায়নি, তা হলে এতক্ষণ হুলুস্থুল বেধে যেত।"

"সেই ঘেঁচি বৌটার নভেল পড়া বাতিক, দিন ভোর জেগে থাকবে সন্ধ্যে হতে না হতে মড়ার মত ঘুম। ভানুদা কত রাগারাগি করে। বৌয়ের আরও গুণ আছে, ঘুণাক্ষরে যদি টের পায় তুমি এসেছ, অমনি জানলার ধারে দাঁড়াবে, তারপর বানিয়ে গুছিয়ে রটারটি! তুমি একটু ওদিকে সরো, নইলে নিন্দে হবে।"

—"তোমাদের বাড়ীতে বুঝি স্ত্রীকে আদর করা নিন্দের!"

—"সব বাড়ীর ধারা ত এক নয়! তুমি আঁতুড় উঠতে না উঠতে চুপি চুপি এসেছ—"

—"তা হলে চুপি চুপি আমাকে ডেকে পাঠাবার কি দরকার ছিল?"

—"ওমা! কি ঘেন্না! তুমি বুঝি তাই ভেবেছ? আমি দরকারী কথা বলবো বলে তোমাকে ডেকেছি। তুমি আমাকে কবে নিয়ে যাবে? আমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। বুঝেছি আমাকে নিয়ে যেতে তোমার ইচ্ছে নেই।"

—"খুব ইচ্ছে আছে, কিন্তু কি বলতে হয়, না-হয় কিছুই যে জানি না শেষকালে নিন্দে হবে। তার চেয়ে তুমিই বল না!"

"আভাসে একদিন বলেছিলাম, শুনে ঠাকুমা বল্লেন—'ওলো থাম্, বর যেন আমরা চোখে দেখিনি। শরীর ভাল করে না সারলে যাবি কি? এবার শ্বশুর নেই, পড়লে হাড়ির দুর্গতি হবে মনে থাকে যেন।' তার চেয়ে তুমি জ্যাঠ্‌ঠামণিকে বল তোমার অসুবিধে হচ্ছে। এবার আমার শরীর ভাল আছে, তাই নিয়ে ঠাকুমা কত কথা শোনান—'ওলো পুরোন নিয়ম কানুন মেনে চললে ডাক্তার-টাক্তার কাউকেই দরকার হয় না।' এবার আগে থাকতেই শরীর ভাল ছিল, ফুলটি হবার পর প্রায় সাড়ে তিন বৎসর বিশ্রাম পেলাম,—এ সব কথা কানেই তুলতে চান না।"

নিরুর গালে গোলাপের আভা এবং স্বচ্ছ সজীবতা ঠিকরে পড়ছে। (যে কারণেই হোক তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'য়েছে)।

ষষ্ঠী পূজায় মাথা ঘষতে হয়, নতুন লাল পাড় শাড়ী পরতে হয়—রুক্ষ এলো চুলে, আডং-ধোলাই লালপাড় শাড়ীতে তাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। সত্যি নিরুকে অনাড়ম্বর সহজ সরল বেশেই বেশী সুন্দর দেখায়।

নিরু বল্লে—"সকলের ঘুম ভাঙ্গল; ভাগ্যে জামা কাপড়গুলো এনেছ, তবু একটা কৈফিয়ৎ রইল।"

একটি ছোট মেয়ে ঘরে ঢুকে বল্লে—"রাঙ্গাদি, জামাই বাবুর চা হচ্ছে তিনি যেন চলে না যান।" বলেই সে ছুটে পালিয়ে গেল।

নিরু বল্লে—"তুমি আর একটু সরে যাও। ঠাকুরদা খোকা হবার খবর শুনে কি বল্লেন?"

"বুঝতেই পাচ্ছ কতটা আনন্দ পেয়ে গেলেন! আমার ভয় ছিল মেয়ে হলে তাঁর মৃত্যুশয্যা কণ্টক-শয্যা হয়ে উঠত।"

—"আমার কিন্তু একটুও ভয় ছিল না, জানতামই এবার ছেলে হবে। উনি শুনে গেলেন এইটুকুই সান্ত্বনা।"

—"মেয়েরা নাকি লক্ষণ দেখে বলতে পারে ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, কিন্তু সে সব প্রায়ই মেলে না, মেজঠান্‌দিকে তাই নিয়ে সকলে কত ঠাট্টা করত।"

—"লক্ষণের কথা নয়। খোকাকে দেখে তুমি কি কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না!"

খোকার দিকে আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখলাম, হৃষ্ট পুষ্ট ছেলে, মাথায় একগাছিও চুল নেই, দুধে আলতায় গোলা রং। বল্লাম —"কই, কিছু বুঝতে পারছি না ত!"

স্নেহে ভক্তিতে নিরুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চাপা গলায় বল্লে —"দেখ খোকার সামনে নাকি বলতে নেই, কিন্তু বাবাই এসেছেন। কত ভালবাসেন আমাকে, ছেড়ে কি থাকতে পারেন!"

চটুল চোখে নিরুর দিকে চেয়ে বল্লাম—"ঠাকুরদা আমাকে ভালবাসতেন, তিনি কি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন? তিনিও এলেন বলে।"

নিরু ঠাকুরদার উদ্দেশে প্রণাম করে বল্লে—"নিশ্চয়ই, তিনিও আসবেন বৈকি! তাঁর ঘর বাড়ী, আমি তাঁর বংশের বৌ। কিন্তু একটু দেরী করে এলে ভাল হয়, লালটুনিকে নিয়ে যা ভুগেছি।"

নিরুর ভক্তিগদগদ ভাবে দেখে হাসি চাপা দুষ্কর হয়ে উঠল। নিরুর রসবোধ কম, কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলাম।

অনভ্যস্তের কাছে মুক্ত বাতাস অস্বস্তিকর, ছাদের তলায় থাকলে ঝড ঝাপ্‌টা গায়ে লাগে না, স্বাধীনতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে বেশ দিনকতক সময় লাগল।

সম্পত্তি হাতে পেলে কি করা যাবে তাই নিয়ে কতরকম কল্পনা ছিল। সকল দিক বিবেচনা করে সাগর পাড়ি দেবার ইচ্ছাকে আপাততঃ স্থগিত রাখাই স্থির করলাম। পরিবারবর্গকে নন্দবাবুর রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে রেখে দিনকতক এখানে-সেখানে যাওয়া যেতে পারে, সে হিসেবে নন্দবাবুকে পেয়ে খুবই উপকার পাওয়া গেছে।

অফিস সম্বন্ধে বিশেষ রকম দায়িত্ববোধ অনুভব করছি। ঠাকুরদা অফিসকে পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি হিসেবে দেখতেন। বাবাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম—"অফিসটা আছে বলেই আমাদের দিয়ে এতগুলি লোকের অন্নসংস্থান হ'চ্ছে।" এই অফিস যদি আমার দোষে অচল হয়—লোকচক্ষে নিশ্চয়ই অপদার্থ বলে গণ্য হব।

দশজন পুরুষ ও চারজন মেয়ে সাহিত্যিককে নিয়ে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হোলো। বাংলোর হল ঘরে সম্পাদকমণ্ডলীর ঘন ঘন সমাগম, অনেক তর্ক বিতর্কের পর পত্রিকার নামকরণ হোলো 'নূতন পত্রিকা'। অর্থের দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকায় স্থির হোলো আমাদের নূতন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের স্থান থাকবে না, এবং লেখক মাত্রকেই উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। ঠিক করলাম নামকরা লেখকদের বাজে লেখা পেলে আমরা সসম্মানে ফেরৎ দেব, প্রতিভা-শালী নূতন লেখকদের উৎসাহ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

সম্পাদক-মণ্ডলীর সকলেই লেখকশ্রেণীভুক্ত। স্থির করলাম

রবিবারের বৈঠকে আলোচনা করবার পর যোগ্য রচনাগুলি প্রেসে পাঠানো হবে।

এই সব কারণে ব্যস্ত থাকায় সংসারের দিকে মন দেবার অবসর পাইনি, ইতিমধ্যে নিরু নিজের পছন্দ অনুযায়ী সংসার গুছিয়ে ফেলেছে। দেখলাম সংসার সম্বন্ধে নিরুর ওপর নির্ভর করা যায়, অল্প বয়সে সে পাকা। এমনিতেই বাড়ীতে অনেকগুলি খালি ঘর পড়ে আছে, বন্ধুদের মতে বাংলোটি অনাবশ্যক, বাংলোর জন্যে ভালো ভাড়াটে খুঁজে দেওয়ার ভার বহন করতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন।

এ বিষয়ে নিরুর মত নেওয়া দরকার। আটাশ বৎসরের কর্ত্তা-মশাই বাইশ বৎসরের কর্ত্রীঠাকুরাণীকে ডেকে বল্লেন, "ওগো শুনছ, বাংলোটা ভাড়া দোব মনে করছি, তোমার কি মত?" গৃহিণীর মত না হওয়ায় বল্লাম—"তা হলে পুরোন আসবাবপত্র কিছু কিছু বিক্রী করতে হয়—পুরোন খাট দু'খানা বিক্রি করলে লাইব্রেরীকে ওপরে উঠিয়ে দেওয়া যায়। নিচের দুটো ঘর পত্রিকার জন্যে রেখে নন্দবাবুকে বাবার বৈঠকখানায়—"

"ছি, ছি কি যে বল! গুরুজনদের ব্যবহার-করা জিনিষ কি বিক্রী করতে আছে? ওই খাটে আমার জামাইরা এসে শোবে। আমাদের অবর্ত্তমানে খোকা যদি বিক্রী করে ত করুক। নিচের ফরাস-টরাস কিছু সরান হবে না, ওঁদের আমলে যেমন ছিল ঠিক তেমনিভাবে সাজান থাকবে। বাংলো ভাড়া দিয়ে কাজ নেই। পত্রিকা অফিস বাংলোতেই বসুক। নন্দকাকার যদি একলা থাকতে কষ্ট হয়, তাহলে তিনি বরং বাবার বৈঠকখানায় থাকুন।"

গৃহিণীপনায় হস্তক্ষেপ করা পুরুষ মানুষের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা

বলে মনে করি। সুতরাং নিরুর ইচ্ছাই শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করল। আসবাবপত্র পুরোনভাবে সাজান থাকল, কিন্তু গৃহব্যবস্থায় বেশ একটু পরিবর্ত্তন দেখলাম। সরকার মশাই এতদিন নিজের ইচ্ছামত দোকান বাজার করে এসেছেন। তিনি পুরোন লোক, তাঁকে ফরমাস করতে নিরুর সঙ্কোচ হয়। সরকার মশাইকে পত্রিকার কাজে নিলাম, অতঃপর দোকান-বাজার চাকরদের দ্বারাই চলবে।

আমরা আত্মীয়স্বজন কারুর কথা চিন্তা করি না, বসুবাগানের ওঁরা নিজেদের দিকে দেখবার অবসর পান না, এই দুটি পন্থাই ভুল। নিরুর মতে তার বড়দির সংসারই আদর্শ সংসার।

আমার জন্যে ছত্রিজাতীয় বেহারা নিযুক্ত করে হরিকে সর্দ্দার চাকরের পদে প্রমোশন দেওয়া হোলো, বেহারাটি বড়দির ননদের বেহারার ভগ্নিপতি। সেজঠান্‌দির মাদ্রাজী আয়ার মাসশাশুড়ী আমাদের বাড়ীর আয়াগিরিতে বহাল হোলো, আয়াটি জল আচরণীয়া।

উদরপূর্তি আর অন্যান্য স্থূল জান্তব স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া নিরুর মাথায় আর কিছুই ঠাঁই পায় না।

শোবার ঘরে তিনটি শিশুর খাট পাতবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। আমার পড়ার ঘরকে নিরুর শোবার ঘর করে পড়ার ব্যবস্থা দোতলার মাঝের ঘরে করলাম। বাধ্য হয়ে দোতলার বৈঠকখানাকে বিক্রী করে দিতে নিরুকে মত দিতে হোলো। বাংলোকে মনের মত করে সাজিয়েছি, বন্ধুরা আমার রুচির প্রশংসা করেন। দোতলায় বড় গোলমাল, চেঁচাতে বারণ কল্লে নিরু মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—"মুখ বুঁজে সংসার চালান যায় না। খিটখিট কল্লে আমি ইস্তফা দোব। এখন থেকে যদি সাবধান না হও বুড়ো বয়সে দাদুর মত মেজাজ হয়ে যাবে।"

আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুন্দর ব্যবস্থা, খাওয়ার পাত্রে নিত্য নূতন আস্বাদ, আমার প্রতিটি স্থূল প্রয়োজনের প্রতি নিরুর সতর্ক দৃষ্টি—নিরুকে চটাতে আমার সাহস হয় না।

সত্যিকারের লেখাপড়া বাংলোতেই হয়। দোতলার পড়ার ঘরে বই মুখে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরের জীবনযাত্রাকে লক্ষ্য করতে ভালো লাগে। ঠাকুরদার কড়া শাসনে, বাবার স্নেহের আওতায় নিরু ভালোভাবে ফুটে ওঠবার অবকাশ পায় নি, এতদিনে তার নিজমূর্ত্তি দেখতে পেলাম, সে মূর্ত্তি আমার কাছে কৌতুকের বিষয়, আমার কৃপার পাত্র।

শুচিবাইতে নিরু আমার পরিচিত সকলকে ছাড়িয়ে উঠল। সকালবেলায় কন্‌কনে সরু গলায় ঝঙ্কার ওঠে—"ভুবনের মা শিগগির ওঠ—যদু আঁশচুপড়ি, পাঁশচুপড়ি ছিষ্টি ঠেকাঠেকি করেছে, এখুনি পৃথিবী একাকার করে ফেলবে। যাও দাঁড়িয়ে থেকে নতুন ঝিকে দিয়ে ভালো করে ধোয়াও গে। ধোওয়া হলে একঘটি গঙ্গাজল ঢেলে দিও।" বিকেলের দিকে শুনলাম—"লালটুনি, হাড়জ্বালানি, ঊর্দ্ধমুখী জমাদারের টব ছুঁয়েছ? ছোঁওনি? ভুবনের মা বুড়োমানুষ, তোমার নামে মিথ্যে কথা বলছে? ভুবনের মা শোনো, উনি এখুনি ওদের নিয়ে বেড়াতে যাবেন। জামা ছাড়ানোর হাঙ্গামা করলে দেরী হয়ে যাবে, একটু গঙ্গাজল এনে জামায় ছিটিয়ে দাও—বেশী দিও না যেন—জামায় ছ্যাবকা ছ্যাবকা দাগ হয়ে যাবে।"

"গঙ্গাজলের ঘটিটা নিয়ে ওপরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখ, উনি যদি ঘরে না থাকেন, ওঁর পর্দ্দাগুলোর ওপরে ভালো করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিও।"

ঠানদি-মহলে নিরুর খুব সুখ্যাতি, তাঁরা প্রায়ই আসেন—"নাতবৌ তোর এখানে দুদণ্ড বসলে মনটা পবিত্র হয়। বড়দি মারা যাবার সঙ্গে ছেলে-বৌরা সব ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে। পুরুষ মানুষের সবই সাজে, তা বলে কি মেয়েদের মুরগী নিয়ে দুর্গোৎসব করা মানায়? রক্তের টান; না গিয়েও পারি না। ফিরে এসে যতক্ষণ না চান করি গা ঘিন্ ঘিন্ করে।"

শুচিবায়ুগ্রস্তাদের আইন বেশ মজার। নিষিদ্ধ পক্ষী রান্না করে মোহন সিং স্নান করে, অথচ খাওয়ার পর আমাকে কিছুই করতে হয় না। আমার গায়ে যখন গঙ্গাজলটুকুও ছিটোন চলবে না, তখন আমাকে নিয়ে ছোঁয়ার বিচার না করলেও চলে।

ভুবনের মাকে সঙ্গে নিয়ে নিরু ভোর থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সকালেই তার ভাঁড়ার, কুটনো, জলখাবার সব কিছু গোছানো হয়ে যায়। সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ দেখানোর, শাঁখবাজানোর পর ছেলে-মেয়ের ভার আয়ার ওপর, আয়াকে লক্ষ্য করবার ভার ভুবনের মার ওপর দিয়ে নিরু আত্মীয়স্বজনদের বাড়ী বেড়াতে যায়। বেশীর ভাগ দিনই তার গতিবিধি ওই বড়দির বাড়ীর দিকে। কোনও কোনও দিন আমি তার সঙ্গী হই, কোনো কোনো দিন একলাই যায়। বিশ্বাসী পুরোন ড্রাইভার—সঙ্গে কেউ না থাকলেও ক্ষতি নেই।

আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে নিরু দোকান বাজারের হালচাল বুঝে

আসে। আত্মসম্মানে আঘাত না দিয়ে তার শাসন করবার পদ্ধতিটিং চমৎকার—"হরি তুমি যে আলু চোদ্দ পয়সা সেরে কিনেছ, তার চেে বড় আলু তিন আনা সেরে পাওয়া যায়—একটু দেখে-শুনে দর-দস্তু করে এনো। যদু তুই বড় ঠকিস্? নিশ্চয়ই অন্যদিকে চেয়ে ছিলি সেই অবসরে মাছওলা তোকে ঠকিয়েছে।"

বাড়ীর দাসদাসীরা আজকাল সুখে আছে, তারা ভালো খেতে পরতে পায়, অসুখ করলে ঔষধ-পথ্য কিছুরই অভাব হয় না। নিরুকে বলতে শুনলাম—"ভুবনের মা, তোমাকে নতুন ঝির কাছে শুতে হবে রাত্রে যদি তার জ্বর বাড়ে? ভাই-বোনের মত এক জায়গায় আছ পরস্পরকে না-দেখলে চলে?" নতুন ব্যবস্থায় ছোট ঠানদি অসন্তুষ্ট হলেন—"এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি? বাড়ীতে ওরা কীই বা খেতে পায়? বিকেলে চা জলখাবার দেওয়া কেন?"

নিরুর উত্তর শুনলাম, তার গলায় স্পষ্ট ঝাঁজের আভাস—"বাড়ীর কথা তুলবেন না। বাড়ীতে ওরা শাকভাত খায়, কিন্তু সে শাক ওদের নিজের পছন্দে রান্না হয়। বড় মাছ কি দৈবাৎ ওদের বাড়ীতে আসে না? সে মাছের মুড়ো ত ওদের পাতেই পড়ে। মা বলে ডাকে, না দিয়ে খেতে পারি না।"

ছোট ঠানদি তর্ককরা সহ্য করতে পারেন না, এতদিনে বুঝি নিরুর জনপ্রিয়তায় ফাটল ধরল। একটা খণ্ড প্রলয়ের আশঙ্কা করছি। অবাক হয়ে শুনলাম—"তুই ঠিকই বলেছিস্—তোর মত ক'টা লোক বোঝে।"

১১

রাত্রের আহার সমাধা করে পাইপ মুখে নিয়ে ডাইনিংকার থেকে নামলাম। আম্বালা ষ্টেশনে কন্‌কনে শীতের হাওয়া, দেখতে দেখতে শরীরের অনাবৃত অংশগুলি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে উঠল।

মাস দুয়েক আগে মোহন সিংকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে বার হয়েছি, এদিকের প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য ভালো ভাবে দেখা হ'য়ে গেছে, এবার ঘর-মুখে রওনা। মোহন সিং ভৃত্য-জগতের রত্ন বিশেষ। তাকে ভালো রকম বক্‌শিস্ করতে হবে।

আত্মীয়স্বজনরা নিরুকে প্ররোচিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। নিরু অবুঝ মেয়ে নয়, সে জানে তার শুচিবাই, লটবহর, তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার সঙ্গ নিলে আমার সুখ, তার শান্তি দুইই নষ্ট হবে। বিদেশে একলা না গিয়ে বন্ধুদেব মধ্যে এক বা একাধিক জনকে সঙ্গী করতে নিরু অনুরোধ করেছিল, তাব দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্যে নিয়মিত চিঠি পত্র টেলিগ্রাফ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, এবং চিঠি-পত্র টেলিগ্রাফ ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে যাচ্ছে।

লোকচক্ষে যাঁরা আমার বন্ধু বলে পরিচিত, তাঁদের ঠিক বন্ধু শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না। তাঁরা আমার অন্তরের খবর জানবার জন্যে আগ্রহান্বিত, আমার দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার একটুও স্পৃহা নেই। স্ত্রীর প্রতি আমার মনের ভাব ঠিক কি রকম তা জানবার কৌতূহল প্রায়ই তাঁদের মধ্যে অশোভন ভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। আমার প্রতি তাঁদের হিংসার ভাব, তাঁদের প্রতি আমার ঘৃণার ভাব

অবহেলাপূর্ণ করুণা। তা সত্ত্বেও ড্রয়িং রুমে আসা-যাওয়া মেলামেশা ভালো ভাবেই চলে যাচ্ছে।

প্লাটফরমের খোলা অংশে আপাদমস্তক ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে একজন লোক বসে আছে। তার সামনে একটুকরো ময়লা স্থাকড়ার ওপর খান কতক পোড়া রুটি, একটু নুন, একটা কাঁচা লঙ্কা। গ্রাস মুখে তোলবার সময় লোকটির চোখ জলে উঠছে। মনের মধ্যে কি রকম মোচড দিয়ে ওঠায় আড় চোখে লক্ষ্য করা চল্ল না, তাড়াতাড়ি নিজের কামরায় চলে এলাম।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমার বিছানা পরিপাটি ভাবে বিছানো রয়েছে। কামরায় লোকজন থাকলে অন্যমনস্ক হবার সুযোগ পেতাম। ক্ষুধিত লোকটির বীভৎস দৃষ্টি আমার মনকে এতই আচ্ছন্ন করেছে যে বইয়ের পাতায় মন দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। বন্ধুরা থাকলে এ বিষয়ে তর্ক করে যুক্তি দিয়ে আমার বর্ত্তমান মনোভাবকে সহজেই উড়িয়ে দিতে পারতাম সস্তা সেন্টিমেণ্ট বলে। খোকাটিকে, মেয়ে দুটিকে, নিরুকে অকারণেই কাছে পেতে ইচ্ছে করছে। বইয়ের পাতায় আবার মন দিতে হয়, কিন্তু মানুষ মন কেড়ে নেবার ক্ষমতা রাখে।

আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে বলেই কি ঐ লোকটির গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্য উপকরণটুকুও অনিশ্চিত! সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই ত দেখা যাচ্ছে জীবন যুদ্ধে অযোগ্যের স্থান নেই। আমরা পুরুষানুক্রমে যোগ্যতার পুরস্কার পেয়ে আসছি, কিন্তু বিবেক নামক বালাইটিকে কবে থেকে মনুষ্যের স্কন্ধে চাপান হয়েছে কে জানে! মানুষ চিন্তা করতে সুরু করেছে, অপরের জন্য বিবেচনা করার নাম সভ্যতা। সেই চিন্তাধারা থেকে নিজেকে কি করে বিচ্ছিন্ন রাখব।

গাড়ী ছাড়তে সামান্য দেরী, একটি অল্প-বয়সী ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে চিৎকার করে উঠল—"এই কুলি লোক, জলদি জলদি—"

ছোকরাব কুচকুচে কালো রং, সুন্দর মুখশ্রী, নিখুঁৎ সাহেবী পোষাক। কোন দেশীয় লোক ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কুলিদের সাহায্যে মালপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে কথা বলে যাচ্ছে—"দেখো এ বড় পেটিঠো নিচে, সুটকেশ দোঠো উস তরফ, বাকি সামান হিঁয়া পব, ব্যস হো গিয়া। কেতনা দেনে পড়েগা? বারো আনা? আরে তুমলোক তো বহুত কম লেনে বালা হ্যায়! লেও পূরা এক রূপেয়া। খুসী? যাও, সেলাম কা জরুরৎ নেহি! ছোড়দি, এবার উঠে আসতে পার।"

ছোড়দি! আগে দেখতে পাইনি। চকোলেট রংয়ের কোট-পরা মূর্তিমতী অমানিশা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঙ্গালীর ঘরে এতখানি কালো রং কল্পনা করা যায় না। সহজে বোঝা যায় না, কোথায় বা চুলের শেষ প্রান্ত, কোথায়ই ব, ভুরুর আরম্ভ। এতবেশী রোগা যে তন্বী বলতে ইচ্ছে করে না। মুখের গড়নে ভাইয়ের সঙ্গে মিল।

সঙ্গের জিনিষগুলিতে বৈচিত্র্য আছে। বেতের টুকরীটি দেখলে লোভ হয়। টিফিন-ক্যারিয়ারে মীনার কাজ, বিছানা পাতা হলো, চাদরে ওয়াড়ে সুন্দর কারুকার্য্য, এদের রুচির প্রশংসা করতে হয়।

ভাইটি রাতের কাপড় হাতে নিয়ে কাপড় ছাড়তে গেছে, বোনটি ঘাড় হেঁট করে পা ছড়িয়ে বসে বই পড়ছে, পায়ে বাদামী রংয়ের সিল্কের মোজা, ঘাড়ের উপর বড় গোল পাতলা ফিরফিরে খোঁপা, বিস্কুট

রংয়ের পাঞ্জাবীর মত ঢিলে পুরো-হাতা গরম জামা, জামার গলা ত্রিকোণ আকারে কাটা, পরণে তসরের শাড়ী। তসরের শাড়ীতে গৌরী, শ্যামলী, অন্ধকার মূর্ত্তি সকলকেই ভালো দেখায়। সুস্পষ্ট কণ্ঠার হাড়, সরু চেনে চারিদিকে মুক্তা বসান, মধ্যে বাদামী ধরণের গোল্ড-ষ্টোনের লকেট, শির-বারকরা আঙ্গুলে ঠিক ঐ গড়নের একটি আংটি, হাতে প্লেন ঢিলে বালা, এ ছাড়া আর কোনও গহনা নেই। এর বেশী সাজ করলে বেমানান দেখাত। মেয়েটি সাজতে জানে। পাশ থেকে মুখখানিকে চমৎকার দেখাচ্ছে, যেন কালীর আঁকা ছবি। মুখ ফিরিয়ে বইয়ের পাতায় মন দিলাম।

ছেলেটির গলার আওয়াজে চমক ভাঙল—"স্যার ট্রেনে আমাদের ঘুম হয় না। আমার আবার চেঁচিয়ে কথা বলার কু-অভ্যাস আছে, আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না ত?"

ট্রেনে আমারও ঘুম হয় না, সুতরাং অসুবিধে হবার সম্ভাবনা নেই, শুনে সে বল্লে—"আমার গায়ে-পড়ে আলাপ করবার কুঅভ্যাস আছে, আপনি হয়ত কিছু মনে করবেন।"

ছেলেটির মধ্যে নূতনত্ব আছে, খুশী হয়ে বললাম—"কিছুমাত্র না—কিছু মাত্র না। লম্বা পথ আলাপে আলাপে কেটে গেলে ভালই হবে। কলকাতা অবধি যাচ্ছেন ত?"

"তাই যাচ্ছি।" কিন্তু আমাকে আবার আপনি কেন? দেখতে বড় হলে কি হয় আসলে আমার বয়েস উনিশ বৎসর নয় মাস মাত্র। ছোড়দিকে অনেকে আমার ছোট মনে করে, কিন্তু ওঁর মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে। সাতটি বৎসর কোলের খুকু হয়ে ছিলেন, তারপর আমি এলাম তাই ছোড়দি আমাকে—"

মৃদু ভৎর্সনার আওয়াজ পাওয়া গেল, ছোড়দির মুখে বিরক্তির চিহ্ন, ছোট ভাইয়ের মুখের হাসি অক্ষুণ্ণ। আমাকে উদ্দেশ করে সে বল্লে—"বাড়ীর লোকের মতে হাঁড়ির খবর ফাঁস করা আমার একটা রোগ, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমি বুদ্ধিমানের কাজ করি। হাটের মাঝখানে সব কিছু মেলে রাখলে লোকের কৌতূহল স্পৃহা মেটে, নইলে লোকে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। যেটুকু দেখতে পায় তার সাদা অংশকে কালো করে কালো অংশে রং চঙ চড়িয়ে, ফলাও করে বাজারে ছড়ায়।"

অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক! ছোড়দি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন। কথা বলে ছোড়দিকে খুশী করতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু সুযোগ পাওয়া দুঃসাধ্য। আমার বিছানার ওপর এ মাসের 'নূতন পত্রিকা'। ছেলেটি প্রশ্ন করলে—"আপনাকে বোধহয় চিনি। আপনি কি নূতন পত্রিকার অজয় মিত্র?"

কি সূত্রে পরিচিত জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—"আপনার একজন পরিচিত লোক, তস্য পরিচিতের তস্য পরিচিত একজনের কাছে আপনার বিষয়ে অনেক খাঁটি খবর শুনেছি। আপনার বাড়ীর আসবাবপত্র সব কাঁচের, বাসন-পত্র সোনার, সপর্দ্দা আইন পাশ হবার আগে স্কুলে পড়তে পড়তে পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। উপস্থিত আপনার পাঁচটি মেয়ে তিনটি ছেলে। চেহারা সম্বন্ধে তিনি কিন্তু অত্যুক্তি করেন নি। এই কামরায় না উঠলেই ভালো হোত, কি বল ভাই ছোড়দি? আমাদের আরও বেশি কালো দেখাচ্ছে, লোকে কত হাসাহাসি—"

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে অন্য কথার অবতারণা করলাম "নূতন পত্রিকা সম্বন্ধে তোমার কি মত ?"

—"ও পত্রিকা নির্ঘাৎ উঠে যাবে, বড় জোর এক বৎসর ওর পরমায়ু। যদি বাঁচে ওর অধোগতি হবে।"

ছোড়দি ধমক দিয়ে উঠলেন—"সুশী তুই কি যে বলিস্? সবজান্তা এঁচোড়ে পাকা ছেলে কোথাকার—"

"কিন্তু মামাবাবু ত এঁচোড়ে পাকা ছেলে নন। বিজ্ঞ ব্যক্তি সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় গাড়ী বাড়ী সব কিছুরই উত্তরাধিকারী, তাঁর মতের দাম আছে ত ? তিনি বলেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান বেশি দিন চলে না।"

"আপনাদের মামাবাবু তাঁর দিক থেকে হয়ত ঠিক কথাই বলেন। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে—"

"নিশ্চয়ই সব কিছুকেই অনেক দিক থেকে দেখা যায়। কিন্তু এই মামাবাবু আমাদের নন। আমাদের বৌদির মামা, সেই সূত্রে ছোড়দি ছাড়া আমাদের বাকি পাঁচ ভাই-বোনের মামা হন।"

ছোড়দির লজ্জিত বিব্রত ভাব দেখে তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বল্লাম—"এদিকে বেড়াতে এসেছিলেন বুঝি ?"

রূপোর ঘণ্টার মত মিষ্টি আওয়াজে ভদ্র মহিলা উত্তর দিলেন—"আমাদের মেজদা বদলী হয়ে এসেছেন, এখানে জল হাওয়া ভালো—"

সুশী কথা না বলে থাকতে পারে না—"সুবিধে পেলেই মা ছোড়দিকে হাওয়া বদলাতে পাঠান কিন্তু জল হাওয়া, দুধ, ঘি, টনিক ইত্যাদি কিছুতেই ও দেহের কিছু হয় না। আমাকে নিয়ে যদি ওর

সিকি চেষ্টা হত তাহলে রংয়ে অজয় মিত্রকে, পারধিতে গামা গোবরকে অনায়াসে হারিয়ে দিতাম। মামাবাবুর কি যে পছন্দ—"

ছেলেটিকে অত্যধিক বাচাল মনে হচ্ছে। কথার মাঝখানে ছোড়দিকে প্রশ্ন করলাম—"নতুন পত্রিকা সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

ছোড়দির মুখে কথার বদলে একটু মিষ্টি হাসি।

ভাইয়ের মুখ থেকে উত্তর এলো—"ছোড়দিকে জিজ্ঞাসা করছেন? ইউনিভারসিটির ডিগ্রি থাকলে কি হয় ছোড়দি আসলে মহামূর্খ। তবে এইটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন—"তাবৎ চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।" আমার কাছ থেকে শুনুন—উনি আপনাদের পত্রিকার ভক্ত পূজারিণী। নিজেও সাহিত্যিক কিনা। গত মাসের নূতন পত্রিকায় 'ছায়াপথ' নামে যে চটি বইটির সমালোচনা করেছিলেন, তিন-চার লাইনে যথা সম্ভব ভালই বলেছিলেন। ইনি সেই 'ছায়াপথের' লেখিকা ইরা রায়। আমার নাম সুশান্ত।"

সহরতলীর শেষ প্রান্তে সবুজ রংয়ের জানালা দেওয়া উজ্জ্বল হলুদ রংয়ের একখানি বাড়ী। সামনের ছোট ফুলবাগানের ছোট গেটের ওপর আইভিলতা। সামনে থেকে যত ছোট দেখায়, আসলে বাড়ীখানি তার চেয়ে বড়। ওপরে নীচে আটখানি ঘর, তা ছাড়া রান্না, ভাঁড়ার, চাকরদের ঘর ইত্যাদি। পিছনে বিঘে দুয়েক জমি নিয়ে সব্‌জি বাগান, বাগানের মাঝখানে পুকুর, লম্বা গোয়াল ঘর, মালির কোয়ার্টারে টালির ছাদ; জালঘেরা মুরগীর ঘর, হাঁসের খোঁয়াড়।

এখান থেকে কলকাতা যাবার ষ্টেশন মাইলখানেকের পথ, বাস চলাচলের ব্যবস্থা আধ মাইল দূরে। সহর এইদিকে ঠেলা দিয়েছে, বেশ বুঝতে পারা যায়, ভবিষ্যতের সারি সারি অট্টালিকা বর্ত্তমানের সবুজ রংকে বিলুপ্ত করে দেবে।

খোলা জায়গায় এই সুন্দর বাড়ীখানি আমাকে নেশার মত আকর্ষণ করে। এক বৎসর আগে এই জায়গাটা কল্পনার বাইরে ছিল, সেটা ভাবতেই পারা যায় না। বাড়ীর লোকদের সহজ সরল আতিথেয়তা, মার্জ্জিত ভদ্র ব্যবহার। ইরা ছাড়া তারা সকলেই খোলা স্বভাবের লোক। ইরা রায়কে সম্পাদক মণ্ডলীর মধ্যে নিয়েছি। মেয়েটির চিন্তা করবার শক্তি, গুছিয়ে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে। বাড়ীতে গাড়ী নেই, ইরাদেবী মামাবাবুর গাড়ী চড়ে রবিবারের মিটিংয়ে যোগ দিতে আসেন, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ভারও মামাবাবুর। যাওয়া,

আসা, মেলামেশায় মামাবাবু ঘরের লোকের মত, সেই জন্য দৃষ্টিকটু লাগে না। পত্রিকা ভালভাবেই চলছে, কিন্তু নন্দকাকা একটু ক্লান্তি অনুভব করছেন, আধুনিক লেখকদের সঙ্গে মতের অমিলই তার কারণ। আমি মধ্যস্থ হয়ে সকল দিক সামলে রাখবার চেষ্টা করি, জানি নন্দকাকা সরে দাঁড়ালেই পত্রিকা অচল হ'য়ে যাবে।

মিটিংয়ের ফাঁকে ইরা রায় নিরুর সঙ্গে দেখা করেন। ইরা সম্বন্ধে নিরুর মনের ভাব ভালই—"এত যে লেখাপড়া শিখেছে বোঝা যায় না। ওগো তোমার বিদুষী বন্ধুণী মেয়েদের জন্যে দুটি নাম ঠিক করেছেন "সম্পা" 'চম্পা'—আমার ত ভালই লেগেছে, এখন তোমার পছন্দ হলেই হয়।"

বুদ্ধিতে শান দেবার জন্যে ইরা রায়ের সঙ্গে তর্ক করি, নূতন লেখার অদল বদল সম্বন্ধে তাঁর মতামত নিলে আমার লেখার শ্রীবৃদ্ধি হয়, আমার হাতে সংশোধিত হবার প্রতীক্ষায় ইরা রায়ের রচনা লোক-চক্ষের অন্তরালে থাকে। বন্ধুরা ইরা রায়কে নিয়ে কটাক্ষ করতে সুরু করেছেন, কিন্তু আমি জানি ইরার চেয়ে ইরার আনন্দময় নীড়খানির আকর্ষণই বেশী।

এই বাড়ীর সদর অন্দরের সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়, বাড়ীটার সব জায়গাতেই অতিথির জন্য আসন। সিঁড়ির লম্বা জানালায় বসে প্রতি-বেশীর পদ্ম পুকুরে রাজহংসের খেলা দেখতে ভাল লাগে। সিঁড়িতে বড় একখানি ছবি থাকে, উপস্থিত রবীন্দ্রনাথের ফটো টাঙানো আছে, কবির মুখে প্রসন্ন হাসি, পা অবধি ঝোলান কালো জোব্বা। সিঁড়ির ছবির অদল বদল হয়, এর আগে নতুন শিল্পীর আঁকা পুরোন ধরণের পট ছিল। এই এক বৎসরে কতরকমের ছবি দেখলাম। সিঁড়ির

কোণে বড় ঘড়ায় ফুল সাজান থাকে, সজনে ফুল, আমের বউল থেকে স্থরু করে, পদ্ম, রজনীগন্ধা সব ফুলেরই সমান সমাদর। ভিতর দিকের খোলা সিঁড়ির মাঝামাঝি বড় চাতালে গল্পের সঙ্গে মুক্তবায়ু সেবনের জন্যে দুখানি লোহার বেঞ্চি পাতা আছে। খাওয়ার ঘরে শীতকালে মির্জ্জাপুরি কার্পেট, গরমকালে মেদিনীপুরি মাদুর বিছান তক্তাপোষ পাতা! বন্ধুরা এইখানে বসে প্লেট হাতে নিয়ে তরকারী চাখার সঙ্গে গল্পগুজব করেন।

গৃহস্থরা সর্ব্বদাই ধোপদস্ত চোস্ত পোষাকে সজ্জিত। প্রত্যেকের আলাদা ঘর, ঘরের সামনে পর্দ্দা, সাড়া দিয়ে ঢুকতে হয়। বাড়ীর লেকেরাও এই নিয়ম মেনে চলেন। পর্দ্দার সামনে দাঁড়িয়ে বলি--"মিস রায় আছেন ত?" প্রস্তুত থাকলে ভিতর থেকে আহ্বান আসে —"অজয় বাবু অস্থন, আস্থন।" নইলে শুনতে হয়—"অজয়বাবু একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আসছি।" এই পর্দ্দাটুকু ছাড়া অন্য কোথাও ঢাকাঢাকির বালাই নাই।

বাড়ীর কর্ত্তা শ্রীমন্তবাবু নীচের ঘরে টক্‌টক্ করে টাইপ করছেন, আমাকে দেখে অভ্যর্থনার হাসি হেসে বল্লেন—"আস্থন। বইয়ের দোকান থেকে তাগিদ দিচ্ছে, নোটটা তাড়াতাড়ি দিতে হবে—বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক—ব্যাপারটা বুঝতেই পাচ্ছেন। ইরা কোথায় গেল? ওগো কোথায় গেলে?" খুঁজে নেব, বলায় আশ্বস্ত হ'য়ে নিজের কাজে মন দিয়ে বাঁচলেন।

সিঁড়িতে সেজদা স্থকান্তবাবু স্থশান্তর সঙ্গে গল্প করছেন। আমাকে দেখে স্থশান্ত বলে উঠল—"এইখানেই বস্থন, ছোটদি চোখ দেখাতে মামাবাবুর সঙ্গে কলকাতা গেছে, বৌদি রান্নাঘরে, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর

মেজাজ খারাপ। আমাদের জ্বালায় ব্যাঙ্ক "ব্যালান্স" ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে হ'তে লয় প্রাপ্ত হতে বসেছে। বড়দা সেদিন হাজার টাকা তুলেছেন, যদিও কথা দিয়েছেন নোট লেখার টাকাটা পেলে শোধ দিয়ে দেবেন, কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস কি? মাতাঠাকুরাণীর হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। কাল সেজদা একজিবিসান দেখতে গিয়ে একখানা ছবি কিনে ফেলেছে, যার দেড়শ টাকা মাইনে সে কেনে দুশ' টাকার ছবি? আয় বুঝে ব্যয় করতে না শিখলে আমরাই ঠক্‌বো।"

বৌদি এসে ম্লানমুখে বল্লেন—"তোমার মামার প্রস্তাবটা মাকে জানাতে বল্লে—মা শুনে আরো রেগে গেছেন, বল্লেন—'আমার ছেলে বোকামী করেছে তার জন্যে তোমার মামা গচ্ছা দেবেন কেন?' বল্লাম 'গচ্ছা দেবার কথাই নয়, পার্টনারের ছেলের বিয়েতে উপহার দেবার জন্যে মামার একটা ছবির দরকার।' শুনে বল্লেন—দরকার থাকে একজিবিশান থেকে কিনে নিতে বল, স্বকুর সখের জিনিষ বেচতে যাব কি দুঃখে।"

সুকান্তবাবু বল্লেন—"তোমার মামা বড্ড বেশি উপকার করতে চান! তেপান্তরের মাঠে রয়েছি, জিনিষ-পত্র এনে দিলেই যথেষ্ট, দাম নিতে না চাইলে বাড়াবাড়ি মনে হয় না কি?"

বৌদি বল্লেন—"তোমরা সহজভাবে কিছু নিতে জান না। গরীবের মেয়েকে আদর করে ঘরে এনেছ, বাপের বাড়ী বলতে ঐ মামাটি সম্বল! মামা মনে করেন বাপ-মা-মরা ভাগনীটির শ্বশুর বাড়ীতে লৌকিকতা কুটুম্বিতা হিসাবে উপহার ইত্যাদি দেওয়া উচিত। অজয়বাবু, আপনি মার সঙ্গে গল্প করলে মার মেজাজ ভালো হয়ে যাবে, রান্নাঘরের কাজ সামান্যই বাকি, সেটুকু সেরে আমিও আসছি।"

সুশান্ত বল্লে—"মেজাজ ভালো দেখলে আমরাও জুটবো।"

সামনের বারন্দায় লাল বর্ডার দেওয়া হলদে সতরঞ্চি পাতা। মা উল বুনছেন। দুচার কথার পর তিনি তাঁর দুঃখের পশরা খুলে ফেল্লেন—"উকিল মানুষ, অ-মাপা টাকা এনেছেন, অপব্যয়ী ছিলেন না, তাই কিছু সংস্থান আছে। জমিজমা কিনে চাষ করবার ইচ্ছেতেই এদিকে বাড়ী করেছিলেন, বলতেন—'চাষের চালের ভাত খেলে চালিয়াৎ হয় না।' ছেলেরা ত সে ধার দিয়ে গেল না। সুমন্ত্রকে বিলেত পাঠাতেই চান নি, আমার ইচ্ছেতেই তার বিলেত যাওয়া। মোটা মাইনে পায়, কিন্তু মেম বৌ, ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই, দেশী মেম বিলিতি মেমের বাবা! বড় মেয়ের বিয়েতে তিরিশ হাজাব টাকা লেগেছে, ছোটটির কি হবে ভেবে কূল পাই না!"

এদেব সুখ-দুঃখে নিজেকে নির্লিপ্ত বাখতে পাবি না। এই পরিবাবেব আন্তরিকতা আমাকেও অন্তরঙ্গ করে তোলে। আজকাল আমিও নিজের বাড়ীর কথা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করি। এঁদেব একটি ছাড়া এখন পর্য্যন্ত কোনও দোষ আমাব চোখে ধরা পড়ে নি। এঁরা অনেক কিছু জানেন, শুধু চাকরদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে কিছু শিক্ষা করেন নি।

রান্নাবাড়ীর কাজ মালী-বৌকে দিয়ে হয়, বাকি কাজের জন্যে সচরাচর দুজন লোক থাকে। দুজনের পক্ষে কাজ একটু বেশি, এঁরা সকলেই কর্ম্মঠ, যে কোনও কাজই নিপুণ ভাবে চালাতে সক্ষম। চাকর থাকলে বোধ হয় মনে করেন ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হতে হয়, তখন হাত-পা গুটিয়ে থেকে অনবরত ফরমাস চালিয়ে যান, খিটখিট করেন। ফলে চাকরদেরও মেজাজ হয়, মুখের ওপর জবাব দেয়,

অবশেষে পাওনাপত্র কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। এই এক বৎসরে অনেক ক'টাকেই আসতে যেতে দেখলাম, শুধু মালীটি চিরস্থায়ী।

মালী মাইনেকরা চাকর নয়। সপুত্র মালীর কঠিন পরিশ্রমে বাগানে সোনা ফলে, উৎপন্ন জিনিষের বারো আনা মালীর প্রাপ্য, বাকি চার আনায় পারিবারিক প্রয়োজন ছাড়া মাঝে মাঝে উপহার দেওয়ার কাজও চলে যায়। অন্ধকার থাকতে মালী বৌয়ের রান্নাঘরের কাজ সারা হয়ে যায়, কাজ সেরে আশে পাশের বাড়ীতে সে দুধ জোগান দিতে যায়। মালীর ছেলে তরকারীর ঝাঁকা মাথায় নিয়ে ট্রেণ ধরতে ছোটে। বাড়তি কাজের ফরমাস করলে মালী সসম্মানে জানিয়ে দেয়,—তার সময়ের অভাব। মালী স্বাধীন ভাবে ষোল আনা কর্ত্তব্য পালন করে, ফাউ স্বরূপ কিছু দিতে সে একান্তই নারাজ।

চাকর না থাকলে শ্রীমন্তবাবু ছেলে দুটিকে স্নান করিয়ে স্কুলের জামা পরিয়ে দেন। মা রান্নার ভার গ্রহণ করেন, অন্যেরা বাকি কাজগুলি ভাগ করে নেন, উৎসাহে সকলের মুখ জ্বলজ্বল করে। বৌদি ননদকে ধমক দেন—"ছোট ঠাকুরঝি তুই আবার ঘর মুছতে এলি কেন?"

মা রাগ করেন—"তা না হলে বাহাদুরি কি? জ্বর করে সকলকে ভোগান চাই ত?"

সুশান্ত বাবু মিনতি করেন—"লক্ষ্মীদিদি, তুই বরং আসবাবপত্র ঝাড়া-মোছা কর, সেগুলোও কাজ!"

মা বলেন—"বৌমা, মালী-বৌকে চার আনা পয়সা কবুল করে বল কাপড়গুলো সাবান দিয়ে কেচে দিতে।"

বৌমা উত্তর দেন—“বাটনা বেটে দিতেই সে গজ্‌গজ্‌ করছিল তার নিজের কাজের অসুবিধে হচ্ছে।”

সুশান্ত বলে—“দরকার কি খোসামোদ করবার? জল চড়িয়ে দিচ্ছি, মা সাবান কুচিয়ে ছেড়ে দাও, ছোড়দি ময়লা কাপড়গুলো নিয়ে এস, আমি আছাড় দিয়ে কেচে দিচ্ছি, বৌদি নীল জলে ডুবিয়ে নিঙ্‌ড়ে তোলো, সেজদা কোথায় গেলেন? ফরসা পরবার ওস্তাদ! সেজদা তুমি ছাতে নিয়ে গিয়ে বেশ করে ঝেড়ে মেলে দাও ত।”

এখন এদের দেখলে মনে হয়—“সর্ব্বং আত্মবশং সুখং।” মাঝে মাঝে চাকর রাখার প্রহসনটুকু বাদ দিলে এরা আমার চক্ষে নিখুঁত।

১৩

রবিবার প্রত্যুষে টেলিফোন মারফৎ খবর পাওয়া গেল যে নন্দ-কাকার ছেলে অসুস্থ। শুনে ভদ্রলোক কালবিলম্ব না করে একটি ছোট স্যুটকেশ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নন্দকাকার বৌমা কলঘরে, তার সঙ্গে দেখা করে যেতে হলে দেরী হ'য়ে যাবে, সে কাজটা সুবিধেমত একদিন এসে করে যাবেন জানিয়ে গেলেন।

যাবার সময় নন্দকাকা পত্রিকার কাজে ইস্তফা দিয়ে গেলেন, জানিয়ে গেলেন পত্রিকা ছাড়া অন্য যে কোন কাজের জন্যে তাঁকে স্মরণ করলেই পাওয়া যাবে।

চকিতের জন্যে মনে হোলো এই ছুতোয় পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিলে অনেক হাঙ্গামা, অর্থব্যয় ইত্যাদির হাত থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু 'নূতন পত্রিকা' সম্পাদক মণ্ডলীর গৌরবের সামগ্রী, গ্রাহক সংখ্যা আশাতীত ভাবে বেড়ে চলেছে, একে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত। মধ্যকলিকাতাবাসী সভ্যদের যে ক'জন টেলিফোন রাখেন—তাঁদের ব্যাপারটা জানিয়ে যাঁদের ফোন নেই তাঁদের জানাতে ও সকলকে তিনটের সময় মিটিংয়ে আসতে অনুরোধ করলাম, স্থির করলাম তাড়াতাড়ি স্নান সেরে মোটর নিয়ে বেরিয়ে দক্ষিণ কলিকাতার সভ্যদের এবং ইরা রায়কে খবর দিয়ে আসব।

ইরা রায় স্বাবলম্বী হতে ইচ্ছুক, মেস বোর্ডিংয়ের খাওয়া সহ্য হয় না, মাইলখানেক হেঁটে ট্রেণ ধরে চাকরী করতে যাওয়া স্বাস্থ্যে পোষায় না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বড়লোকের পুত্রবধূর গৃহশিক্ষয়িত্রী হবার জন্যে ক্ষেপেছিলেন, পরের বাড়ী থাকতে দিতে ভাইয়েরা রাজী

হন না, তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে ইরা দেবী বলেন—"নিজের পায়ে দাঁড়ান আমার কপালে নেই।" ইরা দেবী নন্দকাকার কাজটা গ্রহণ করলে বাড়ী বসেই ভালো রকম উপার্জ্জন করতে পারবেন, আজ সেই প্রস্তাব করে দেখব।

বাইরে যাচ্ছি শুনে নিরু বললে—"ফিরতে দেরী হবে না ত? মনে করছি আজ জামাইবাবুদের খেতে বলবো, রাত্রে জামাইবাবু হাল্‌কা খান, নইলে রাত্রেই বলতাম।"

বললাম—"দেরী হবে কেন? কিন্তু আজ না বলে আসছে রবিবারে বল না। আজ ঝামেলার মধ্যে—"

"আসছে রবিবারে ওঁদের পাচ্ছ কোথায়? ওঁরা শুক্রবারেই দেশ ভ্রমণে রওনা হচ্ছেন। ওঁদের অনেক দিনের সাধ বছর খানেক ঘুরে সমস্ত ভারতবর্ষটা ভালো করে দেখবেন, ছেলে-মেয়েদের কার কাছে রেখে যাবেন বলেই এতদিন সম্ভব হয় নি। জামাইবাবুর ভাই বদলি হয়ে এলেন বলেই যাওয়া ঘটে উঠল।"

"জামাইবাবুর ভাই বদলি হয়ে এসেছেন বুঝি?"

"কেন পরশু ত' তুমি নিজের চক্ষে জামাইবাবুর ভাইকে দেখলে! ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হোলো—এরি মধ্যে ভুলে গেলে! আজকাল তোমার মন কোথায় থাকে?"

লক্ষ্য করে দেখেছি নিরু আজকাল ইরার উপর সন্তুষ্ট নয়, তাদের বাড়ী যাব শুনলে মুখ ভার করে। না বোঝার ভাণ করে বললাম—"কোথায় থাকে তুমিই বল না?"

"তোমার মন যে আজকাল সব সময় রাইয়ের কুঞ্জে পড়ে থাকে! সে কথা সকলেই জানে।"

"রাইয়ের কুঞ্জ ? সে আবার কোন চুলোয় ?"

"আহা আর ন্যাকাপনা কর না। জান না বুঝি জামাইবাবু ইবাব নাম উল্টে বলেন রাই। তোমার বাড়াবাড়িরকম মেলামেশা সকলের চোখেই খারাপ—"

"তোমার জামাইবাবু কূপমণ্ডুক! কিন্তু তোমার কাছে এরকম আশা করিনি। শেষকালে ইরা রায়কে হিংসে করতে সুরু করলে? গলায় দড়ি দাও!"

আমার কথার প্রচ্ছন্ন খোশামোদের সুর নিরুর মনকে স্পর্শ করলো। লজ্জারক্তিম মুখ নীচু করে বললে—"আমি সে রকম কিছু মনে করি না। জামাইবাবু ঠাট্টা করে রায়কে বাড়িয়ে রাইয়ের কুঞ্জ বলেন— শুনে মনের মধ্যে একটু—"

তার লাল টুকটুকে গাল টিপে আদর করে, ফিরতে দেরী হবে না বলে বেরিয়ে পড়লাম।

সামনের বাগানে সুশান্ত বোধ হয় আমার প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল গাড়ী দাঁড়াতে সে গাড়ীর মধ্যে উঠে এলো—"শুনুন, বিশেষ গোপনীয় ব্যাপার—কাউকে না বলতে পেরে হাঁফিয়ে উঠছি। দুদিন আসেননি এরি মধ্যে প্রলয় কাণ্ড। মামাবাবু বিয়ের কথা মুখ ফুটে কাউকে না বললেও, তাঁর মনের কথা সকলেই জেনে গিয়েছিল। ছোটদিব এস্পার-ওস্পার কিছু না ঘটা অবধি অপেক্ষা করাই মামাবাবুর সংকল্প জানতাম, হঠাৎ তিনি অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন। আমাদেরই একজন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া মামাবাবুকে খুব খাওয়াচ্ছেন, ভদ্রমহিলার একটি চমৎকার মেয়ে আছে। মামাবাবুর মতে সে মেয়ে ছোড়দির পায়েব ধূলোরও যোগ্য নয়। পরশু রাত্রে মার সঙ্গে মামাবাবুর অনেক কথা

হ'য়েছে, রাত্রে মা ছোড়দিকে বকাবকি করেছেন, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে আলেয়ার পেছনে ছুটে কি লাভ হবে? রূপে গুণে অমন ছেলেকে পছন্দ হয় না কেন? ছোড়দি সদুত্তর দিতে না পারায় মা ছোড়দির সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। কাল দুপুরে কলেজ কামাই করেছি। ছোড়দি বৌদির কাছে কেঁদে খুন, 'যতীনবাবু সুপাত্র বলেই কি তাঁকে আমায় বিয়ে করতে হবে? আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান ত আমি নিজেই করে নিতে পারি। অসুখে বিসুখে আমার ভাই বোনরা যদি আমাকে না দেখে স্বামীই যে দেখবেন তার স্থিরতা কি? মা দুদিন সময় নিয়েছেন, কি দরকার তোমার মামাবাবুকে ঝুলিয়ে রাখবার? তুমি ফোনে ডেকে তাঁকে বুঝিয়ে বল।' আলেয়া কথাটা বৌদির বোধ হয় খুব ভালো লেগেছে, তিনি তাঁর মামাবাবুকে আলেয়ার পিছনে না ছুটে বিয়ে করে সংসারী হতে অনুরোধ কল্লেন। মামাবাবু নাকি একটি ছোট্ট কথায় উত্তর দিয়েছেন—'দেখি'। চলুন বাড়ীর মধ্যে, লোকে হয়ত সন্দেহ করছে আমি হাঁড়ির কথা ফাঁস করছি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বলবেন আমি গাড়ী সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করছিলুম।"

বর্ত্তমান অবস্থায় মামাবাবুর গাড়ী চাওয়া শোভন নয়, বোধ হয় সেই জন্যে ইরা দেবী মিটিংয়ে যেতে রাজী হলেন না। আমার ড্রাইভার অসুস্থ, দুপুরে আর একজনের আসবার কথা আছে, ঠিকানা দিলে সে হয়ত চিনে আসতে পারে, কিন্তু নূতন অজানা ড্রাইভারের সঙ্গে ইরা দেবীর যাওয়া উচিত হবে না। ভাইদের অন্য কাজ আছে তাঁরা সঙ্গে যেতে অক্ষম, আমিই যথাসময়ে নিতে আসবো বলে উঠে দাঁড়ালাম।

শ্রীমন্তবাবু আমাকে একটু আড়ালে ডেকে বল্লেন—"আপনি এক কাজ করুন, শুধু শুধু এতটা পথ যাওয়া আসার কি দরকার? যার মন

খারাপ, আপনি এখানে খাওয়া দাওয়া সেরে ইরাকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবেন, খাওয়াতে পেলে মা ভারী খুশী হন। ফোনে বাড়ীতে জানিয়ে দিন।'

ফোনে বেহারাকে পেলাম। মাঈজী রান্নাঘরে, তাঁকে জানিয়ে দিতে বল্লাম যে আমি এবেলা বাড়ীতে খাব না। বড়দিদের নিমন্ত্রণের কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিল। আমাকে খাওয়ানোর জন্যে বিশেষ আয়োজন করতে একটা বেজে গেল। আমাকে খাওয়ান উপলক্ষ্যে মা-মেয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হোল দেখে খুশী হলাম।

আড়াইটার সময় বাড়ী পৌঁছলাম। মিটিংয়ের এখনও আধ ঘণ্টা দেরী। সভ্যরা এখনও আসেন নি। ইরাকে বাইরের বসিয়ে নিরুকে খবর দিতে গেলাম। নিরু ইরাকে ডেকে পাঠালে কথায় বার্ত্তায় আধ ঘণ্টা কেটে যাবে, সেই সময় আমি কাপড় ছেড়ে নেব। নিরুর মুখ অন্ধকার, সে তীব্র স্বরে বল্লে—"আমাকে ক্ষমা করো, সকাল থেকে রান্না করেছি, এখন একটু বিশ্রাম করবো।"

"ওহো! ওঁরা এসেছিলেন বুঝি!"

"নিমন্ত্রণ করলে না এসে উপায় কি?"

"ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।"

কোনও উত্তর না দিয়ে নিরু ঘর থেকে চলে গেল। এ রকম বাড়াবাড়িব মানে হয় না। কড়া শাসনে না রাখলে মেয়ে মানুষ মাথায় উঠে বসে। বাইরে এসে ইরাকে নিরুর শরীর খারাপ হ'য়েছে বলায় তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

যথাসময়ে মিটিং বসল। ইরা দেবী বাড়ীর লোকদের মত নিয়ে ভার গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন। ফেরবার সময় আমার যাওয়ার

প্রয়োজন হোল না। সুশান্তকে সঙ্গে নিয়ে মামাবাবু এসে গেলেন। তাঁকে না ডাকার জন্যে ইরা দেবীকে মৃদু ভৎর্সনা শুনতে হোলো।

রাত্রে নিরুর গম্ভীর মুখের উত্তরে আমিও মুখ গম্ভীর করে রইলাম। পরদিনও সারাদিনরাত্রি একভাবে কাটল। মঙ্গলবার সকালে শ্রীমন্তবাবু ফোনে আমাকে ডেকে পাঠালেন, কি যেন ঘটেছে—আমার তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। তখুনি বেরিয়ে পড়লাম।

নীচের ঘরে শ্রীমন্তবাবু গম্ভীর মুখে বসে আছেন, তিনি আমাকে একটি টাইপ করা ইংরাজী চিঠি দিলেন। কাঁচা ইংরাজীতে চার পাতায় অনেক কাকুতি-মিনতি, হিতোপদেশ, মহাজন-বাক্য যার মোদ্দা কথা হোলো: ইরা দেবী দয়াবতী, বুদ্ধিমতী এক কথায় তিনি নারীজগতের রত্ন, আমার বেচারী-স্ত্রীর প্রতি অনুকম্পা করে তিনি যেন আমাকে প্রশ্রয় না দেন। চিঠির মধ্যে নিরুর বড়-জামাইবাবুকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

শ্রীমন্তবাবুর ভাবে ভঙ্গীতে বুঝতে পারলাম তিনি মেলামেশা তুলে দিতে চান। ইরা দেবী কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন—"ওপরে বোধ হয় কান্নাকাটি করছে। মাকে বা ভাইদের কাউকে চিঠির কথা জানাইনি, সম্প্রতি বাড়ীতে একটি ব্যাপার ত চলছে সবাই জানে কান্নাকাটি তারই জের।"

ইরা দেবীকে ডেকে পাঠাতে তিনি সজল চক্ষে শুকনো মুখে এসে হাজির হলেন। তাঁর মুখ দেখে আমার রাগ এসে গেল, বল্লাম—"ছি ছি আপনারা একটা বেনামী চিঠিকে এতখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?"

ইরা দেবী দু' হাতে মুখ ঢেকে কান্নার মধ্যে থেকে বল্লেন—"মেলা-মেশা থাকলে লোকে আরও কত কি বলবে—"

সমগ্র বিশ্বের ওপর বিতৃষ্ণা এসে গেল। চিঠিটা পকেটে নিয়ে চলে এলাম। নিরুকে জিজ্ঞাসা করলুম, চিঠিটার বিষয় সে কিছু জানে না শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। নিরুর মুখে ভয়ের চিহ্ন। ধমক দিয়ে বল্লাম—"ন্যাকামি রাখ। ভগ্নিপতিকে দিয়ে এ চিঠি তুমি লেখাওনি?"

নিরুর মুখের ভয়ের চিহ্ন মিলিয়ে গেল, তার সর্বাঙ্গে গর্বিত ভাব, সে উত্তর দিলে—"জামাইবাবু এ ব্যাপারের প্রতিকার করবেন বলেছিলেন। তবে চিঠির কথা জানতাম না আমি।"

"তোমার জামাইবাবুর স্পর্দ্ধা ত কম নয়—আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আসেন।"

"তোমার ব্যাপারে আমার সুখ দুঃখ জড়িত না থাকলে তিনি কিছুই করতেন না—"

"জামাইবাবুর কাছে কান্নাকাটি করা হয়েছে? ছোট ইতর মন। তুমি যে তোমার জামাইবাবুর কোল ঘেঁসে বস, পিঠে মুখ লুকিয়ে হাস আমি ত আপত্তি করি না।"

"ছোট থেকে ওঁর কোলেপিঠে মানুষ হয়েছি—তোমার সত্যিকারের আপত্তি থাকলে নিশ্চয়ই করবো না।"

চিৎকার করে উঠলাম—"আজ থেকে আপত্তি করছি তোমার পেয়ারের ভগ্নিপতি যেন আমার বাড়ী না ঢোকেন।"

শান্ত গলায় নিরু উত্তর দিলে—"বেশ তাই হবে। চিৎকার করলে লোকে কি ভাববে? আমি চললাম।"

অসুস্থতার ছুতোয় বিছানা নিলাম। তরল পাদার্থ ছাড়া দুদিন কিছুই খেলাম না। তৃতীয় দিন রাত্রে নিরু আমার ঘরে এসে পায়ের কাছে বসে বল্লে—"আমার দোষ বুঝতে পেরেছি। কাল ইরাদির

কাছে ক্ষমা চেয়ে আসব, তুমি নতুন ড্রাইভারকে রাস্তা বুঝিয়ে দিও, সরকার মশাই সঙ্গে যাবেন। জামাইবাবুও ক্ষমা চাইতে রাজী আছেন।"

বুঝলাম জামাইবাবুর সঙ্গে আলোচনা সমানভাবে চলছে, বললাম—"দরকার নেই। ইরা রায়ের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করবে না! সকলে ত তোমার বা তোমার জামাইবাবুর মত স্থূল নয়। কি এমন করেছিলুম যার জন্যে হাটের মধ্যে দুঃখের পশরা খুলে বসেছ?"

"ঘরে তোমার মন বসত না—সর্বদাই ইরাদের বাড়ী যাবার জন্যে ছটফট করতে—দেখে শুনে লোকের মনে সন্দেহ, আমার মনে দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।"

"তোমার ওপর আমার মন কোনও দিন বসে নি। এ ব্যাপারে ত রীতিমত ঘৃণাই এসে গেছে। আমি অটল মিত্রের নাতি, আমাকে রাগিও না। আমার সামনে থেকে দূর হও।"

নিরু বিদ্যুৎ গতিতে পাশের ঘরে চলে গেল। পাশের ঘরে খোকা কাঁদছে। অন্যদিন তাকে ঘুম পাড়াতে নিরুকে গুণ গুণ করে গান করতে হয়—আজ হয়ত খোকার কান্নার সঙ্গে তার মার কান্না মিশে যাচ্ছে। আলেয়ার জন্যে ঘরের স্ত্রীকে অবহেলা করে লাভ কি। খোকার কান্না থামবার প্রতীক্ষায় আছি—সুবর্ণ সুযোগ হারালাম—ভাব করবার জন্যে অনেকখানি নীচু হতে হবে। খোকা ঘুমোবার আগেই খোকার বাবার চোখে ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙলে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম ছটা বাজতে কুড়ি মিনিট দেরী। চোখ বুঁজে শুয়ে সন্ধি-স্থাপনের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম। নিরুর আত্মসম্মানজ্ঞান টনটনে, আমিও নীচু হতে জানি না। এতখানি ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটেনি। নিরুব সপক্ষে বিপক্ষে কত রকম কথাই মনের মধ্যে উদয় হতে লাগল।

হর্ণের শব্দে চমকে বাগানের দিকে চেয়ে দেখলাম—গাড়ী গেট পার হয়ে গেল। গাড়ীর মধ্যে সুসজ্জিতা নিরু, পাশে আয়ার কোলে খোকা, নতুন ড্রাইভারের পাশে সরকার মশায়। নিরুর হলদে জরী পাড় শাড়ী, লাল জামা, কানে নতুন কানপাশা। মাছরাঙা পাখীটি সেজে এত সকালে কোথায় উড়ে গেলেন!

কলিং বেল টিপলে মোহন সিং এসে ঘাড় নিচু করে জানাল—মাঈজি জিজ্ঞাসা করতে বলে গেছেন আমি কি খাব? আর যা কিছু বলেছেন সব বাংলা ভাষায়, বেহারা সে সব কিছু বুঝতে পারেনি, ভুবনের মাকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে। ভুবনের মাকে ডাকতে সে ঘোমটা দিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বল্লে—"মা বলে গেছেন মাংস আনিয়ে রান্না করতে দাও, বেশী করে গোটাকতক আলু ভাতে দিয়ে ডাল ভাত চড়ানো হোক, তারপর মা এসে পড়ে বাকি ব্যবস্থা করবেন।" তারপর ঘোমটা আর একটু নামিয়ে আমি কি খাব জিজ্ঞাসা করলে। ভাত খাব শুনে সে চলে গেল।

আজ বড় দিদিদের রওনা হবার দিন, বুঝলাম যদি বিকেলে সুবিধে না হয় তাই দেখা করবার কাজটা এ বেলাতে সেরে রাখবার জন্যে

নিরু বড়দির বাড়ী গেছে, তাছাড়া কাল রাত্রের ঘটনাটা দিদিদের জানানো চাই ত। কিন্তু দিদির বাড়ী যেতে ত এত সাজসজ্জার দরকার হয় না! নিরুকে সংসারের কাজ ফেলে সকাল বেলায় কোথাও যেতে দেখিনি। ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষ্যে বাপের বাড়ীতে সকালের নিমন্ত্রণ থাকলে এগারটার আগে তার যাওয়া ঘটে ওঠে না, তাই নিয়ে বাপের বাড়ীতে নিরুকে অনেক অনুযোগ শুনতে হয়। আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি কম—অভিমানিনী নিরুর মাথা খারাপ হয়ে যাবে না ত!

টিং টিং করে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। ছোটঠানদির কণ্ঠস্বরে আনন্দউচ্ছ্বাস—"নাতবৌ আজ এইখানেই খাবে, তার ফিরতে দেরী হতে পারে—ভুবনের মাকে সব কিছু গুছিয়ে নিতে বল।" হঠাৎ নিমন্ত্রণ খাবার সখ হোলো কেন জিজ্ঞাসা করায় শুনলাম—"নাতবৌ এসে পড়ল—আবার কবে দেখা হবে, তাই খেয়ে যেতে বল্লাম"। "আচ্ছা" বলে ফোন ছেড়ে দিলাম।

নিরু কি ছোটঠানদির সঙ্গেও কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে? তা যদি হয় নিরুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না। লোকনিন্দাকে গ্রাহ্য না করলেই হোলো। আমি ত ইরা রায়ের মত ক্ষণভঙ্গুর নই।

সরকার মশাইয়ের গলা শোনা গেল—"ভিতরে আসতে পারি কি?" ভিতরে এসে তিনি বল্লেন—"মা কখন ফিরবেন ফোনে জানিয়েছেন কিছু?"

"কখন ফিরবেন আপনাকে কিছু বলেন নি? আপনি ত সঙ্গেই গেলেন?"

"আমাকে ত সকালেই ফিরবেন বলেছিলেন, দুটো চিঠি দিয়েছিলেন—মেসোমশাইকে, নন্দবাবুকে। এই তাঁদের জবাব টেবিলের

ওপর রইল। একটা পাঁচশো টাকার চেক্ দিয়েছিলেন—একশ টাকার নোট নোব, না খুচরো নোব, ফোনে জেনে নিইগে।"

নন্দবাবুর চিঠিতে খামের বালাই নেই, ছেঁড়া খাতার পাতায় পেনসিলে খোলা চিঠি। নন্দকাকা নিরুবৌমার মেয়ে দুটির ভার গ্রহণ করতে রাজি আছেন, তাদের লেখাপড়া শেখানো, যথার্থ সুশিক্ষা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে তারা যাতে মার অভাবে কষ্ট না পায় সব কিছু তিনি দেখবেন। নন্দকাকার ছেলে অন্নপথ্য পেলেই তিনি খুকু দিদিমণিদের কাছে চলে আসবেন।

রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠল। নন্দকাকার উপর মেয়েদের ভার দিয়ে নিরু বোধহয় আত্মহত্যা করবে! ফেরবার পথে কোনও ছুতোয় গঙ্গার ঘাটে গাড়ী থামিয়ে নেমে যাবার মতলব আছে হয় ত! আয়াটা বোকা, দুপুরে ঘাটে লোকজন কম, ডুবে মরবার অসুবিধে নেই।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। ছোটঠানদির বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্য বোঝা গেল। মাতৃহীন ভাগনে-ভাগনি মানুষ করে ছোটঠানদি সুনাম কিনেছেন, উপস্থিত মনুপিসির মাতৃহীন ছেলে দুটি ছোটঠানদির কাছে। ঠাট্টার ছলে হয়ত নিরু জানিয়ে রাখবে—"ছোটদিদিমণি বলা ত যায় না যদি মারা যাই খোকা আপনার কাছে থাকবে।"

নিরুর জন্যে ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল, উপায়ান্তর না দেখে ছোটঠানদিকে ডাকলাম, ছোটঠানদি খিল খিল করে হেসে উঠলেন—"এরি মধ্যে এত! নাতবৌকে ছেড়ে কি করে থাকবে তুমি? সে রওনা হয়ে গেছে, এখুনি বাড়ী পৌছে যাবে।"

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না বলে মন অস্বস্তিতে ভরে আছে।

ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল নিরুর দেখা নাই। ছোটঠানদির পুরোন গাড়ী পথে নিশ্চয়ই বিগড়ে গেছে। তিনটে নাগাদ ফিরে এল। তার কোলে রোরুদ্যমান খোকা, পিছনে আয়া বেহারা। আয়ার হাতে দুতিন কৌটো গ্লাকসো ফুড, বেহারার হাতে অনেকগুলি কাগজের মোড়ক।

বেহারা-আয়া নীচে নেমে গেলে নিরুর ঘরে গেলাম, নিরু খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছে, খাট ধরে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

খোকার কপালে মৃদু চাপড় দিতে দিতে চাপা গলায় নিরু বল্লে—"ছোটদিদিমণির বাড়ী।"

"শুনলাম একটার সময় সেখান থেকে বেরিয়েছ, এতক্ষণ ছিলে কোথায়?"

"দোকানে, বাজারে।"

"এই সব জিনিষপত্র নিয়ে কি হবে?"

"দরকার আছে।"

"হঠাৎ পাঁচশো টাকার চেক ভাঙালে কেন?"

"দরকার ছিল।"

বিরক্ত হয়ে নীচে নেমে গেলাম। টেবিলের ওপর হলুদ রংয়ের খামে 'শুভ বিবাহ' লেখা। কার কপাল পুড়ল খুলে দেখি। খুলে দেখলাম—শ্রীমান যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীমতী ইরার শুভ বিবাহে আগামী রবিবারে যোগদানের জন্য সবিনয় নিবেদন। এই চিঠি নিয়ে নিরুর কাছে গিয়ে বলি—"বিবাহ অনেকদিন থেকেই স্থির ছিল এবং এই বিবাহে আমি ঘটকালি করেছি।" কথাটা নেহাৎ মিথ্যা বলা হবে না—ইরার মায়ের অনুরোধে ইরা দেবীকে মামাবাবুর জন্যে একটু ভেবে দেখতে মাঝে মাঝে অনুরোধ করতাম।

নিরুর ঘরের মেজেয় দুটো বড় বড় খোলা স্যুটকেশ, অনেক জিনিষ-পত্র ছড়ানো আয়া স্যুটকেশ গোছাতে ব্যস্ত নিরুর হাতে টেলিফোনের রিসিভার, উত্তেজিত চাপা গলায় সে বলছে—"আমার কি হবে, না হবে, কে কী ভাববে না ভাববে তাই নিয়ে তোমারই দেখছি যত মাথা ব্যথা? আমার ভাল লাগছে না, আমি যাবই। না নিয়ে গেলে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। জামাইবাবু ত নিমরাজী হয়েছিলেন, তোমারই যত দুষ্টুবুদ্ধি! মেয়েদের লেখাপড়া আছে, তারা যাবেনা, তারা আপাতত: ছোটঠানদির কাছে থাকবে। ওখানে থাকতে তারা ভালবাসে। খোকার দুধ? আমাকে বোকা বুঝিও না। টুনিদির কচি ছেলে সঙ্গে যাচ্ছে। তার জন্যে দুধের জোগাড় হবে না? তা ছাড়া ছোটদিদিমণির ওখান থেকে ফেরবার পথে ডাক্তারবাবুর ওখানে গিয়েছিলুম। তিনি বল্লেন, খোকা বড় হয়েছে এটা সেটা খায়, বেশি করে ফল ডিম খেতে দিলে, দুচার দিন দুধ না পেলে ক্ষতি নেই। মেয়েদের নিতে ছোটদিদিমণি আসছেন তাঁরই গাড়ীতে তোমাদের ওখানে যাব।"

রিসিভার রেখে আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিরু বল্লে—"শুনেছ বোধ হয়, এতক্ষণ কিছু ঠিক হয়নি বলে জানাই নি।"

"যখন আমার মত নেওয়া দরকার মনে কর না, তখন জানাবারই বা কি দরকার? এটুকু ভদ্রতা—"

"ভদ্রতা অনেক করেছি—এখন থেকে তুমিও স্বাধীন, আমিও স্বাধীন।"

"বুঝেছি এই জন্য পাঁচশো টাকার দরকার, কিন্তু টাকাটা আমারই দেওয়া হাত খরচের—"

"আমার নিজস্ব গহনাগুলো সিন্দুকে আছে, তার দাম কম করেও সাত আট হাজার টাকা। টাকার দরকার ছিল না, দিদির ননদ সঙ্গে যাচ্ছে তার চোখে ধূলা দেবার জন্যে—"

"তোমার ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেবার জন্যে যদি তোমাকে ত্যাগ করি—"

"ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে যা ভালো মনে হয় কোরো, আপত্তি নেই। মেয়েদের খাওয়া হয়ে গেল, আমি তাদের সাজিয়ে দিতে যাচ্ছি।"

যথা সময়ে ছোটঠানদি এসে গেলেন। নিরুর সহজ ব্যবহার হাসি মুখ! আমার গম্ভীর মুখ দেখে সান্ত্বনাচ্ছলে ছোট ঠানদি বল্লেন— যাচ্ছে বটে নাতবৌ বছর খানেকের জন্যে কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠবে। নাতবৌ আমি তোর মালপত্র, ছেলে, মেয়ে, আয়া নিয়ে গাড়ীতে উঠছি। তুই নিরিবিলিতে শেষ পর্বটা সেরে নে।"

বড়দির ননদের চোখে ধূলো দেবার জন্যে নিরু পরিপাটি সাজগোজ করছে—কালো শাড়ী ব্লাউস্ জামা, কালো জুতো, হাতে ভ্যানিটি, গলায় কানে কালো কাচের গয়না, কপালে কাঁচকড়ার কালো টীপ। সে গম্ভীর মুখে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। শূন্য বাড়ী গিলে খেতে আসছে। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেরই ক্লাবে যাওয়া অভ্যাস আছে। দু একদিন গিয়ে দেখেছি ভালো লাগেনি। নিরু তার যোগ্যতার চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছে। কড়াশাসনে না রাখলে মেয়েরা মাথায় চড়ে বসে।

আদুরে মেয়ে নীরু বাপের বাড়ীতে কুশিক্ষা পেয়েছে। আমার মেয়েদের এখন থেকে সুশিক্ষা দিতে হবে। নন্দবাবুর বাড়ী গিয়ে পরামর্শ করি। নন্দবাবুর বাড়ীর নম্বর গলির নাম জানা আছে, কিন্তু

জায়গাটা কোথায় ঠিক জানি না। নতুন ড্রাইভার কলকাতার পথ ঘাট ভাল ভাবে জানে কি না জানবার জন্যে তাকে ডেকে পাঠালাম, সে এসে ঘাড় হেঁট করে সামনে দাঁড়ালো।

লোকটার চোয়াড়ে চেহারা বদমাইসের মত পোষাক-পরিচ্ছদ, দশ-আনা ছ-আনা ক'রে চুল ছাঁটা। দেখলে হাড় জ্বলে যায়। লোকটা বেশ্যাবাড়ীর দালাল নয় ত? এর সাহায্যে নিরুকে জব্দ করা যায় না? সিনেমার উগ্র সাজ-করা মেয়েদের ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠল।

সেই সব মেয়েদের বেনামী চিঠি দিয়ে ভয় পাওয়ানো যায় না। যন্ত্রচালিতের মত একখানা পাঁচটাকার নোট বার করে ড্রাইভারের হাত দিলাম। সে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কি আনতে হবে স্যার?"

"কিছুই না। ওখানা তুমি রাখ। কোনও অ্যাক্‌ট্রেসের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পার কি? মেয়েটা যেন সাত হাত ঘোরা না হয়—"

"স্যার, সে সব আমি কিছু বলতে পারবো না। আমার মাসতুতো ভাই কমলা ফিলিমে চাকরী করে, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবো কি?"

"আচ্ছা তাই কোরো। এ সব কথা যেন বাইরে প্রকাশ না হয়।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাদের কথা নিয়ে চালাচালি করলে আমাদেরই বিপদ।"

পরদিন সকালে নীচের ঘরে খাতাপত্র গুছিয়ে বসতে যাচ্ছি, খাকি সার্ট, হাফপ্যাণ্ট পরা মজবুত চেহারার একজন লোক সামনে এগিয়ে এসে চাপাগলায় বল্লে—"আমি আপনার ড্রাইভার মুরলীলালের ভাই বংশীলাল। আপনি নাকি একটি ফিলিমের মেয়ে চান?"

লোকটার কথা বলবার ভঙ্গী ভালো লাগল না। এই শ্রেণীর লোককে এর আগে আমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখিনি।

বল্লাম—"না সে রকম কিছু তাড়া নেই। 'প্রতিদান' ছবিতে যে মেয়েটি নায়িকার পার্ট করেছে, সে নাকি বি এ পাশ—"

লোকটি চমকে দু হাত কানে দিয়ে জিব বার করে তারপর জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বল্লে—"ছি, ছি, কি যে বলেন? দীপিতা যে ভদ্রঘরের মেয়ে পাঁচসাতটি ছেলে মেয়ের মা, স্বামী রুগ্ন, পেটের ধান্দাতে তাঁর সিনেমার নামা।"

লোকটির ভাবভঙ্গী দেখে অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইলাম। সে আমাকে সান্ত্বনা দেবার মত করে বলে যেতে লাগল—"দীপিতা দে-কে ছবিতে যেমন দেখেন তিনি দেখতে মোটেই সে রকম নয়, কালো কুচকুচে, হতকুচ্ছিৎ, পেৎণী। আমার সন্ধানে একটি খুব ভালো মেয়ে আছে। নাচিয়ে, গাইয়ে, দিব্বি শাঁসে জলে হৃষ্ট পুষ্ট মেয়ে, থোড় থোড় গড়ন। কমলা ফিলিমে নতুন এসেছে। বৃন্দাবনলীলা দেখেন নি? মুকুলিকা দেবী। রাধিকার প্রধান সখি। মেয়েটির বয়স বড় জোড় চোদ্দ কি পনেরো। তার মা আপনার মত একটি সুপাত্রের অপেক্ষাতে রয়েছে। তাকে দেখলে আপনার অপছন্দ হবে না, তবে কি আপনার পরিবারের মত—"

বাধা দিয়ে বল্লাম—"উপস্থিত আমার মেয়ের দরকার নেই, পরে মুরলীকে দিয়ে জানাব। এই দশটা টাকা নাও, ডেকে না পাঠালে এস না।"

তাকে বিদায় দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

নিরু চলে যাওয়ার পর মাসাধিক কাল অতীত হয়ে গেল। বড়দির ছোট ননদের চোখে ধূলি নিক্ষেপের জন্যেই বোধ হয় নিরুর কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে দুতিন খানা চিঠি পাই, একই উদ্দেশ্যে আমার কাছ থেকে চিঠি যায়, অযাচিত ভাবে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছি—বড়দিদি ননদ শ্রেণীদের উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

'নূতন পত্রিকা' শৈশব অতিক্রম করবার সুযোগ পেল না। এই বৎসরের বাকি দুটি সংখ্যা ছাপা হওয়া অবধি তার জীবনের নির্দ্দিষ্ট কাল। পত্রিকার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার ওপর এসে গেছে। তার জন্যে খানিকটা সময় ব্যয় হয়, বাকি সময় টুকু কাটানো দুষ্কর। আমি ঘর-কুণো মানুষ।

বেশীক্ষণ বাইরে থাকা পোষায় না। আমার অবস্থা উপলব্ধি করে ছোটঠানদি মাঝে মাঝে মেয়েদের পাঠিয়ে দেন, তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। লালটুনির লাজুক স্বভাব, বেশি কথা বলে না। ফুলটির কিন্তু চোখে মুখে খৈ ফোটে। বলে—"বাবা তুমি মার সঙ্গে গেলে না কেন? তা হলে ত তোমার মন কেমন সারাবার জন্যে আমাদের আসতে হোত না।"

ছোটঠানদি লজ্জিত হয়ে কৈফিয়ত দেন—"মেয়ে মানুষ এখন থেকে মায়া কাটানো অভ্যাস করছে।"

নির্বান্ধব শূন্য পুরী। বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা করে না, আমার মেয়েরাও আমাকে চায় না। অফিসের কাজ করতে করতে মনে

হোলো ওদের যথেচ্ছ চলতে দেওয়া উচিত হবে না। এখন থেকে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার অভ্যাস করানো দরকার। মেয়েদের অত্যধিক আদর দিলে তারা ওদের মায়ের ধারা পাবে।

ফিরতি পথে মনে হোলো, আজ ছোটঠানদির বাড়ী গিয়ে স্কুলের রিপোর্ট ভাল হচ্ছে না বলে ওদের জোর করে নিয়ে আসব। নন্দকাকা ছেলেকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে গেছেন। তিনি ফিরে না আসা অবধি মেয়েদের ভার আমাকেই নিতে হবে।

রাস্তা থেকেই দেখতে পেলাম আমার মেয়ে দুটি বাগানের মধ্যে খেলা করছে। মহারাণীরা হঠাৎ কি মনে করে? তাদের কোলে দুটি বড পুতুল, পরনে বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ী, হাত ভর্তি গালার চুড়ি, কপালে বেমানান রকমের বড় চক্‌চকে রংচঙে টিপ। নিরুপমা দেবী সম্প্রতি কাশীবাস করছেন, বুঝলাম জিনিষগুলি তাঁর কাছ থেকে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—"এসব পেলে কোথায়?"

"মা'র কাছ থেকে।"

"কে নিয়ে এলো এই সব বিশ্রী জিনিষ?"

"মা-ই ত নিয়ে এলো।"

"মা নিয়ে এলো! মা কোথায়?"

"তিনতলায়—নিজের ঘরে।"

দ্রুত পায়ে উপরে উঠে এলাম। ভুবনের মা ঝক্‌ঝকে নতুন ঘটি হাতে নীচে নামছিল, আমাকে দেখে জড় সড় হয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। বারান্দায় খোকাকে ঘিরে বাড়ীর অধিকাংশ ঝি চাকরদের জটলা চলছে, প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে নতুন ঘটি। এতগুলি লোকের লক্ষ্যস্থল হওয়ায় খোকার মুখে গর্বিত হাসি। মাঝের ঘরে

জিনিষপত্র ছড়িয়ে আয়ার সাহায্যে গৃহকর্ত্রী গোছানোর কাজে ব্যস্ত। আমাকে দেখে আয়া চলে গেল। নিরুর মুখে নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব। খাটের উপর জাঁকিয়ে বসে প্রত্যেকটি জিনিষের সুখ্যাতি করতে আরম্ভ করলাম।

গম্ভীর মুখে নিরু এক সময়ে উত্তর দিলে—"ঢেঁকি যদি স্বর্গে যাবে ধান ভানবে কে? মধুপুরে থাকতেই অরুচি, বমি সুরু হয়ে গেল। বড়দি ত রেগেই খুন—'এই শরীর নিয়ে ট্রেনে হ্যাটোর হ্যাটোর করে একটা বিপদ বাধাবি? তোকে নিয়েও ফ্যাসাদ আর আমাদেরও যাওয়া পণ্ড। তিন ছেলের মা, নেকি বুঝতে পারিস না কেন?' কাশীতেই নিয়ে যাচ্ছিল না, টুনিদি জোর করে নিয়ে গেল। সেই খান থেকে ওদের পুরোন বিশ্বাসী কর্মচারীকে দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে।"

ঘণ্টাখানেক খোসামোদ খাওয়ার পর অভিমানিনী ধরা দিলেন। কাশীতে থাকতে তিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ লীলার সুখ্যাতি শুনেছেন। শুনে আমার তাঁকে পাশে নিয়ে রাধাকৃষ্ণলীলা দেখবার বাসনা হোলো—টিকিট কিনে আনবার জন্যে সরকার মশাইকে ডেকে পাঠালাম। সরকার মশাই বল্লেন "বৃন্দাবনলীলার টিকিট ত শুনছি সাতদিন আগে থেকে কাটতে হয়—যদি না পাওয়া যায় চিত্রমহলে—"

"চিত্র মহলে কি বই হচ্ছে?"

"ব্রজলীলা। বইটা নাকি সুবিধের হয়নি।"

সরকার মশাইকে খাতির দেখাবার জন্যে নিরু তার সামনে আমার সঙ্গে কথা কথা কয় না, মুখে একটু ঘোমটা দিয়ে রাখে। সে চাপা গলায় বল্লে—"না, না, ব্রজলীলার টিকিট কিনবেন না।" আমি বল্লাম—"যদি বৃন্দাবনলীলার না পান, যে কোনও ছবিঘরের যে

কোনও লীলা। শিশির ভাদুড়ী নাকি অনেক দিন পরে আবাব নামছেন। একটু খোঁজ করে দেখবেন, খুঁজতে খুঁজতে যদি দেরী হয়ে যায়—ফিরে আসবার সময় না থাকে—ফোনে জানিয়ে দিয়ে টিকিট নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে থাকবেন।”

সরকার মশাই হাসি চাপতে চাপতে চলে গেলেন। নিরু ভুরু কুঁচকে ভর্ৎসনার সুরে বল্লে—“ছি, ছি, কী ছেলেমানুষী করলে, সরকার মশাই কি মনে করলেন।” চেয়ে দেখলাম তার মুখে হাসি উপছে পড়ছে।

যথা সময়ে বিজয়ী বীরের মত সরকার মশাই ফিরে এলেন। বৃন্দাবনলীলায় একখানি মাত্র বক্স খালি ছিল। এক সেকেণ্ড দেরী হ'লেই পাওয়া যেত না। সরকার মশায়ের মায়ের ইচ্ছে পূর্ণ না হয়ে যায় না। সরকার মশাইয়ের পিছনে অন্ততঃ পঁচিশ জন নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, নারায়ণ তাঁর সহায়।

সময় সংক্ষেপ; গাড়ীর গতি দ্রুত। সংযতভাষিণী নিরু অস্বাভাবিক ভাবে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। মুখে যাই বলুক না কেন জোর করে ফেরত পাঠানোর জন্যে সে বড়দির কাছে কৃতজ্ঞ। টুনিদি নাকি জিদ করছিলেন—বলছিলেন, বেড়ালে কিছু হবে না। ‘ভাগ্যে পোড়ারমুখি বড়দি ছিল।’ নিরু বসে বলল। সস্নেহে নিরুর হাতে চাপ দিলাম।

আরতি সিনেমায় বিপুল জনসমাগম। ভিড় ঠেলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে বেগ পেতে হোলো। ‘বক্সটি আরামপ্রদ নয়’ মন্তব্য করায় নিরুর কাছ থেকে উত্তর পেলাম “ভাগ্যে ছিল বলেই এই গদিছেঁড়া একপেশে সিট পাওয়া গেল, নইলে ব্রজলীলা দেখতে হোত, সেখানে

নাকি সারি সারি খালি সিট! সুন্দর সুন্দর মেয়ে জোগাড় করে কেবল নাচ গান, তাছাড়া আর কিছু নেই।"

সুন্দর সুন্দর মেয়ে! নাচ গান? বংশীবর্ণিত সেই থোড় থোড় গড়ন বোধহয় তারি মধ্যে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম—"বৃন্দাবন লীলায় নাচগান নেই?"

"আছে বৈকি, একজন নাচিয়ে-গাইয়ে নতুন মেয়ে শ্রীরাধার প্রধান সখি সেজেছে, তার নাম মুকুলিকা। নামটা বেশ সুন্দর নয়? মেয়েটাকে নাকি দেখতেও ভালো।"

বিজ্ঞাপন, বিদেশী খবর, আগতপ্রায় ছবির খণ্ডাংশ দেখানো শেষ হোলো। এইবার আসল ছবি—

বৃন্দাবনে শীতের প্রকোপ। গোপবালারা স্কার্ফ গায়ে দিয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দূরে শুভ্র বরফ রাশি, হঠাৎ বাঁশী বেজে ওঠায় বরফ গলে গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে শুষ্ক তরুলতা পুষ্পপল্লবে হোলো মঞ্জরিত সঙ্গে সঙ্গীতপর কোকিলকুল। রীতিমত ভরা বসন্তের আবির্ভাবে সখিরা স্কার্ফ ফেলে দিয়ে নৃত্য সুরু করলেন। ক্রমে বংশীধ্বনি এগিয়ে এল। এরপর কৃষ্ণ দেখা দিয়ে নৃত্যে যোগদান করলেন। নৃত্যপটু কৃষ্ণের খেয়াল হোলো 'রাধিকা কই?' সখিরা বল্লে—"এর উত্তর প্রধানা সখি ললিতা দিতে পারে।"

প্রধানা সখি ললিতা এসে বল্লে—"সখা তুমি ত বাঁশি বাজিয়ে খালাস, রাধাকে কত সহ্য করতে হয় জান কি?" তারপর সখির সঙ্গে কৃষ্ণের ডুয়েট্ নৃত্য চলতে লাগল।

প্রধানা সখির সুগঠিত বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লাবণ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

বয়স মোটেই চোদ্দ পনেরো নয়, সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে। বল্লাম—"এই তোমাদের মুকুলিকা ?"

"হ্যাঁগো এই—খবরের কাগজে ছবি দেখনি ?"

"না দেখিনি, কিন্তু কি এমন সুন্দরী ?"

"কেন বেশ ত দেখতে, একটু নয়নখোল, নাকের ডগাটি সামান্য মোটা, কিন্তু নীচের মুখটা ভারী মিষ্টি, কপালখানি চাঁদের মত।"

পর্দ্দার গায়ে রাধিকার ঘরসংসার ফুটে উঠল। দধিমন্থনরতা রাধা; কাছেই জটিলা-কুটিলার সামনে রাশীকৃত দই। বাঁশির স্বর রাধিকার কানে প্রবেশ করতেই তিনি বল্লেন—"এইবার আমি জল আনতে যাচ্ছি।"

জটিলা গর্জন করে উঠল—"জল এনে এনে জালা, কলসী, ঘড়া ঘটি বাটি সব বোঝাই করে ফেলেছ, আবার জল আনলে রাখবে কোথায় ?"

"ও জল বাসি হয়ে গিয়েছে, ফেলে দিয়ে নতুন জল আনি।"

"হোকগে বাসি, আমাদের ন্যাকা বোঝাতে চাইছ ?"

রাধিকা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠায় জটিলা মিষ্টি করে বল্লে—"এখন ত শীতকাল নেই, বসন্ত এসে গেছে—বাসি জলই মিষ্টি লাগবে।"

"কিন্তু আমার যে বাসি জল খাওয়া অভ্যেস নেই। আমি রাজ-নন্দিনী, তৃষ্ণা পেলেই আমার দাস দাসীরা দূরের স্রোতস্বিনী থেকে জল ধরে এনে দিত।"

মুখ বিকৃত করে হাত নেড়ে কুটিলা বল্লে—"তা হলে তোমার বাবা তেমনি ঘরে মেয়ে দেননি কেন ? আমাদের গৃহস্থ ঘরে ওই

রকম বড়মানুষী চাল চলবে না। মা দাদাকে ডাকো ত, ঘা কতক আচ্ছা করে দিক্। দাদা, ও দাদা—"

জটিলা মেয়েকে ধমক দিয়ে উঠল—"কি যে বোকার মত কাজ করিস—আয়ান রাগী মানুষ। ওর বাপ বৃষভানু যে আমাদের জমিদার সে কথা কি ভুলে গেছিস? ঝাড়েমূলে শূলে চড়িয়ে দিলে মজা টের পাবি।"

মায়ে ঝিয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল, সেই সুযোগে শ্রীরাধা সরে পড়লেন। সামান্য একটু অদল বদল করে বারবার একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। ঝগড়ার দৃশ্যগুলি স্বাভাবিক ও উপভোগ্য। প্রিয়সান্নিধ্যে শ্রীবাধা জড়ো-সড়ো হয়ে যান কৃষ্ণের লীলাখেলা সবই প্রধানা সখির সঙ্গে।

যথারীতি কৃষ্ণের মথুরাগমন হোলো, বৃন্দাবনের পথে ঘাটে আবাল-বৃদ্ধবনিতার হাহাকার। পাগলিনী রাধাকে বুকে জড়িয়ে কুটিলা বল্লেন—"বৌ এতদিনে তোমার দুঃখ বুঝতে পারছি। একটু কিছু খাও, তারপর কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যাত্রা কব।"

শ্রীরাধা বল্লেন—"ঠাকুরঝি কৃষ্ণকে নিয়ে ফিরে আসি তারপর খাব।" বলে তিনি হেঁট হয়ে শাশুড়ির পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন। যমুনার ধার দিয়ে দৌড়বার সময় তাঁর দীর্ঘ কুন্তল, এলোমেলো অঞ্চল উড়তে লাগল। ছুটতে ছুটতে একটি জঙ্গলে প্রবেশ করে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। দূরে গাছপালার ফাঁকে রাজপ্রাসাদের চূড়া দেখা যাচ্ছে। প্রধানা সখি গাছের আড়াল থেকে বার হয়ে এলো—"সখি আমি যে চিরদিনই তোমার অনুগামিনী, তোমাকে অনুসরণ করে এতদূর পথ হেলায় চলে এলাম। ওঠ, ঐ মথুরার চূড়া দেখা যাচ্ছে।"

শ্রীরাধা বল্লেন—"সখি তুমি কৃষ্ণনাম গান কর, পার যদি একটু নৃত্যও কর, আমি একটু দম নিয়ে নি।"

নাচ গান চলতে লাগল। ইত্যবসরে শ্রীরাধা ব্লাউসের মধ্যে হাত গলিয়ে কৃষ্ণের ছবি বার করে দেখতে লাগলেন পদ্মপলাশ নয়ন জলে ভরে গেল, দীর্ঘ পল্লবে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু।

নিরু দুহাতে শক্ত করে আমাকে চেপে ধরে আছে, হয়ত তার আশঙ্কা কৃষ্ণের মত দুর্মতি আমারও হতে পারে। তার চোখের জলে আমার সিল্কের জামা ভিজে চপচপে।

ফেরবার পথে নিরু আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা কল্লে—"তোমারও খুব ভালো লেগেছে—নয় ?"

তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বল্লাম—"কি করে বুঝলে ?"

"এরকম আচ্ছন্নের মত বসে থাকৃতে এর আগে তোমাকে কখনও দেখিনি।"

গাড়ীতে মুরলীলাল ড্রাইভারের পাশে তার মাসতুতো ভাই বংশীলাল। বংশীলাল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বক্-বক্ করে যাচ্ছে। তার কথা বলার পদ্ধতি, বসবার ভঙ্গী অসম্মানসূচক। আমার মনে অস্বস্তি, কান মাথা গরম, কিন্তু উপায় কী। লোকটার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে তাকে চটালে বিপদের আশঙ্কা।

"জানেন মশাই, আছি আছি বেশ, সাত চড়ে রা নেই, কিন্তু চটে গেলে কারুর খাতির করি নে—সেই কথাই ত আমাদের প্রোপ্রাইটার সাহেবের ভাইপোকে বল্লাম—অনেক গোপন কথা জানি—ব্যাটার টিকি আমার হাতে বাঁধা—বাছাকে মাথা তুলতে দোব না—শা—ল্লা। স্লা।"

অথচ লোকটা খাতির করতেও জানে, প্রোপ্রাইটার সাহেব সম্বন্ধে তার মত—"শিববাবু স্বভাব চরিত্রে সাক্ষাৎ শিব—আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে মেশেন,—হাসি মস্করাও করেন, কিন্তু কার সাধ্যি তাঁর সামনে মাথা তুলে কথা কয়—তাঁকে বেখাতির করে?"

স্বভাব! চরিত্র! বোধ হয় এই কারণেই বংশীলাল দীপিতা দেবীর অসাক্ষাতেও তাঁকে অসম্মান দেখাতে অপারগ। এখনও আমার স্বভাব-চরিত্রে কালীর দাগ পড়েনি, কিন্তু ফেরবার উপায় নেই! কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমাকে জাহান্নামের পথে নিয়ে চলেছে! কিন্তু এই লোকটা! যে আমার কাছে হাত পেতে টাকা নিয়েছে, ভবিষ্যতে ভাল রকম পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখে, তার এত কথা বলবার কী অধিকার?

বংশীলালের বক্‌বকানি থামবার নয় "—শেফালীর বয়েস ঠিক আঠারো, আঠারো পূর্ণ হয়ে উনিশ চলছে, সেদিন যদি চোদ্দ পনেরো না বলতাম—আপনি ভাবতেন বারো হাটের কানাকড়ি। ডালিম কীর্ত্তনওয়ালী যার গানের রেকর্ড আছে, সেই ডালিমের দুই মেয়ে—সরমা, মনোরমা। মনোরমার মেয়ে শেফালী। শেফালী বলবেন না যেন, চটে যাবে। সিনেমায় ঢুকে মুকুলিকা নাম নিয়েছে। ডালিম দুই মেয়েকে দু'খানা বাড়ী দিয়ে গেছে, মনোরমা নিজেও থিয়েটার করত—শরীর খারাপ হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে। নিবারণ ভট্টাচার্য—থিয়েটার সঙ্গীতে নিবারণবাবুর ছবি দেখেন নি ? সেই নিবারণবাবুর মেয়ে শেফালী—হুবহু নিবারণবাবুর মত মুখ চোখ। নিবারণ বাবুও শেফালীকে কিছু টাকা দিয়ে গেছে—অভাব ত কিছু নেই, সেই জন্যে মনোরমা মেয়েকে লেখাপড়া, নাচ গান শিখিয়ে ভদ্রলোকের পাতে দেবার মত করে তৈরী করেছে। আগে থেকেই বলে রাখছি, রং খুব ফরসা নয়, তবে কালোও বলা চলে না। গঙ্গাজলি গম দেখেন নি ? সেই রকম লাল্‌চে লাল্‌চে রং—ভালো খায়, দিব্যি জোল্লাদার"—

কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ মিশিয়ে বল্লাম—"তোমার কথা থেকে মনে হ'চ্ছে যেন তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রকম আত্মীয়তা"—

"আত্মীয়তা বলতে পারেন। আমার দিদি খুড়ু ঐ বাড়ীতে পনেরো বচ্ছর ভাড়াটে। মেয়ে ত এতটুকু বেলা থেকে আমাকে মামা বলে ডেকে আসছে।"

বংশীর মুখে লজ্জা সঙ্কোচের চিহ্ন মাত্র নেই !

মিনার্ভা থিয়েটার পিছনে ফেলে গাড়ী একটা গলির মধ্যে ঢুকল। গলির মাঝামাঝি জায়গায় শেফালিকা ওরফে মুকুলিকার বাড়ী।

সকৌতূহলে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম—সামনের বড় বাড়ীর একতলার রকে, দোতলা তিনতলার বারান্দায় রংমাখা, রঙ্গীন শাড়ীপরা মেয়ের দল দাঁড়িয়ে আছে। মুকুলিকাদের বাড়ীর একতলায় রক্, দোতলা, তিনতলায় বারান্দা নেই, বোধ হয় সেই জন্যেই কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল না। একতলায় চায়ের দোকানের সামনে 'জগদানন্দ রেষ্টুরেণ্ট' লেখা। পাশে চুল কাটবার সেলুন। ওপাশের ঘরের জানালায় ছেঁড়া ঢাকাই শাড়ীর পর্দা, বংশী বল্লে—ঘরখানি তার দিদি খুতুর। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় খুতুর ঘর চোখে পড়ে, দরজায় পর্দা নেই, আসনে আসীন একজন প্রায় বৃদ্ধ। সামনের থালায় রুটি তরকারী, পটল ভাজা—পাখা হাতে মেয়েটিই বোধ হয় খুতু। বিছানায় আড়ম্বর, বালিসের বাহুল্য, জলচৌকীর ওপর সাজানো ঝক্ঝকে বাসনগুলি না থাকলে গরীব গৃহস্থ ঘরের ছবি বলে মনে হোত। দোতলার সামনের ঘরের দরজায় ভারী পর্দার আড়ালে হারমোনিয়ামের সঙ্গে গানের সুর, হাসির হল্লা। তিন তলায় ওঠবার সময় খুতুর ঘরের ঠিক ওপরের ঘরে পর্দার ফাঁক দিয়ে যে মেয়েটিকে উপুড় হয়ে বই পড়তে দেখা গেল, সে নিশ্চয়ই মুকুলিকা।

তিন তলার চারিদিকখোলা ছাতের মধ্যে একখানি মাত্র বড় ঘর। সস্তা দামের কৌচ-কেদারা দিয়ে বসবার ঘরের মত করে সাজানো। একটা বড় তক্তপোষের ওপর দুটো তাকিয়া, হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা, একপাশে ছোট্ট একটি 'রাইটিং টেব্‌ল।' ঘরের মধ্যে মুকুলিকার মা, তার শীর্ণ মুখে অভ্যর্থনার হাসি, বড় বড় চোখে ভিখারিণীর করুণ দৃষ্টি। থান কাপড়-পরা মায়ের বয়সী

এই মেয়েটিকে আপনি বলে কথা বলতে ইচ্ছা করে না, তুমি বলতেও মুখে আটকায়।

বংশীর মধ্যস্থতায় কথাবার্তা, দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেলে বংশী সিঁড়ি থেকে ঘাড় বাড়িয়ে ডাক দিল—"খুকুমণি ওপরে এস, মনোদিদি ডাকছেন।"

খুকুমণি উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর সাজসজ্জা সুসম্পন্ন হয়ে গেছে, জামার প্যাটার্ণ, চুল আঁচড়ানোর কায়দা, দাঁড়াবার ভঙ্গি অবিকল 'প্রতিদান' চিত্রের দীপিতা দেবীর মত। 'প্রতিদান' চিত্রের নায়িকা প্রথম দর্শনে যে রকম নিঃসঙ্কোচ কৌতূহলের সঙ্গে নায়কের দিকে চেয়েছিলেন, মুকুলিকাও সেই রকম দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল।

বংশী তার দিদির কাছে চলে গেছে। মুকুলিকার মাও চলে যেতে ইচ্ছুক। আমার মনে নববধূসুলভ লজ্জা, কথায় ছুতোয় মুকুলিকার মাকে আটকে রেখেছি। হঠাৎ চোখ পড়ে যাওয়ায় দেখলাম, মুকুলিকার সর্বাঙ্গ থেকে অভিনেত্রীর ভাব খসে গেছে, তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সে এক ঝটকায় ঘর থেকে চলে গিয়ে চীৎকার করে বল্লে—"মা এদিকে আয়, আমাকে জিজ্ঞেস না করে সিনেমা ছাড়ব বলেছিস কেন?"

বাইরে ঝটাপটি ঝগড়ার শব্দ। দরজার কাছ থেকে মুকুলিকার মার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—শুকনো রসকষহীন মন্তব্য—"না বাপু, মেয়ে সিনেমা ছাড়তে রাজি নয়—সত্যিই ত তোমরা ত চিরস্থায়ী নও।"

সহজপ্রাপ্য এই মুকুলিকার জন্য এত ফ্যাসাদ। অধৈর্য্য হয়ে

ঘরের মধ্যে থেকেই জবাব দিলাম—"চিরস্থায়ী! চিরস্থায়ী বল্‌তে কিছু আছে নাকি? ক্ষতিপূরণ হিসেবে যা চান দিতে রাজি আছি। বলতে নেই আপনার মেয়ে একটু হৃষ্টপুষ্ট—যদি গায়ে বেশি রকম গত্তি লেগে যায়—তখন ধুপ ধুপ্ করে নাচলে কি লোকে তার কদর করবে?"

বাইরে হাসির আওয়াজ, মুকুলিকা হাসতে হাসতে ছুটে নীচে পালিয়ে গেল। অপূর্ব্ব প্রাণখোলা হাসি, সেই হাসির রেশ বাতাসে মেশানো রয়েছে, হাসির ছোঁয়াচ লেগে মুকুলিকার মার মুখে স্বাস্থ্যের রক্তিম আভাস, হাসতে হাসতে আমিও বল্লাম—"ডাকুন আপনার মেয়েকে—সিনেমায় আমার আপত্তি নেই।"

ফিরতি পথে বংশীলাল সঙ্গে নেই। হালকা মনে ভবিষ্যতের করণীয় সম্বন্ধে চিন্তা করছি। এ ব্যাপার কখনও চাপা থাকে না, সাজিয়ে, গুছিয়ে, বাড়িয়ে, কমিয়ে, সত্য-মিথ্যায় মিশিয়ে আজই নিরুকে জানিয়ে দিতে হবে। পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত থাকলে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি প্রবল আকার ধারণ করবার অবকাশ পায় না।

কলরবহীন গৃহ। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, বই হাতে নিয়ে নিরু আমার খাটের ওপর বসে, সে ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করলে—"কিগো, তোমার বন্ধুরা এরি মধ্যে ছেড়ে দিলেন?"

"বন্ধুদের বাড়ী যাইনি—তোমরা যাকে নরককুণ্ড বল সেই পল্লীর একজন অভিনেত্রীর বাড়ী গিয়েছিলাম।"

রসিকতা মনে করে নিরু একবার হাসবার চেষ্টা করে আমার দিকে সংশয়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। উজ্জল আলোয় নিরুর সামনে দাঁড়িয়ে

থাকা অসাধ্য হয়ে ওঠায় আমি তার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেলাম। চোখের তারা স্থির, ঝাপসা চাঁদের আলোতেও বোঝা যাচ্ছে তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা। মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল,—কেন জানাতে গেলাম, জানতে না পারলেই ত শান্তিতে থাকত, কিন্তু এখন ফেরাবার চেষ্টা করা নিরর্থক। বল্লাম—"তুমি চলে যাওয়ার পর নতুন ড্রাইভারের সাহায্যে একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তখন তোমার ওপর রাগ করেই—কিন্তু এখন এতটা জড়িয়ে পড়েছি যে, আমার পক্ষে তার সংশ্রব ত্যাগ করা অসম্ভব।"

নিরুর নিশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জোর করে মনকে শক্ত করে বল্লাম—"এরপর বোধ হয় তোমার ওপর আমার আর জোর চলবে না। যখন একনিষ্ঠ স্বামী ছিলাম, তখনও তুমি আমার বশে ছিলে না, নিজের ইচ্ছামত চলেছ, এখন ত আমার বলবার মুখই রইল না। আমি লুকোচুরির বিপক্ষে, নইলে ত তুমি জানতেও পারতে না। বইয়ের ভাষায় বলতে গেলে—সে আমার নর্মসহচরী, দিনান্তে ঘণ্টা-দুয়েকের সঙ্গিনী। তুমি যে পাটরাণী আছ, চিরদিন তাই থাকবে। আমার যা বলবার ছিল বল্লাম, এখন তোমার কর্ত্তব্য তোমার হাতে, ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে দেখ।"

নিরু কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ছেড়ে যাওয়া দুঃসাধ্য, তার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারা যায় না। বলবারই বা বাকি কী আছে?

হরির গলার স্বর শোনা গেল—"মা, যদু দুধ-সাবু খেতে চাইছে না, সে বলছে বেশি করে লেবু নুন দিয়ে জলবার্লি খাবে। আপনি একবার দেখবেন কি?"

শান্ত গলায় "চল দেখি" বলে নিরু স্বাভাবিকভাবে চলে গেল। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখতে লাগলাম। যদি নিরুর সংসারে আকর্ষণ কমে যায়, যদি সে আমাকে আমল না দিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, যদি সে নির্লিপ্ত উদাসীনের মত সংসারের একপাশে পড়ে থাকে, হয়ত তাকে শত চেষ্টাতেও আর বাঁধা যাবে না। মোহন সিংয়ের গলার আওয়াজে চমক ভাঙল, খাওয়ার ঘরে খাব না, বারান্দায় টেবিল লাগান ঘরের উত্তরে খাওয়ার ঘরে খাব বল্লাম।

খাওয়ার ঘরে মখমলের আসনের সামনে রূপোর বাসনে রাজসিক আয়োজন, নিরুর মুখ স্বাভাবিক শান্ত। ভরসা পেয়ে বল্লাম—"তুমিও এই সঙ্গে খেয়ে নিলে না কেন?"

"খেয়ে নোব? একটু কাজ বাকি ছিল—আচ্ছা আগে খেয়ে নি।"

খাওয়ার সময় নিরু বল্লে—"বিহারীবাবু ভালো হয়ে গেছেন, কাল থেকে কাজ করতে পারবেন। নতুন ড্রাইভারকে—"

নতুন ড্রাইভারের প্রসঙ্গে লজ্জিত হলাম, এই নতুন ড্রাইভারই নিরুর শনি। বল্লাম—"সরকার মশাইকে বোলো নতুন ড্রাইভারের মাইনে চুকিয়ে দিতে।"

নিরু উত্তর দিলে—"আমি বলছিলাম দুজন থাকলেই সুবিধে। লালটুনিকে শুকনো দেখাচ্ছে—স্কুলের গাড়ীতে যেতে তাড়াতাড়িতে ভালো খাওয়া হয় না। ক্ষীণজীবী মেয়ে—দুজন সোফার থাকলে বাড়ীর গাড়ীতেই স্কুলে যেতে পারবে। নতুন ড্রাইভার শুনছি ভালো মিস্ত্রী। সে থাকলে টুকিটাকি কাজের জন্য গাড়ীকে ওয়ার্কশপে পাঠাতে হবে না।"

ঘাড় হেঁট করে বল্লাম—"তুমি যদি ভালো মনে কর তুজনই থাক্।"

গভীর রাত্রে বারান্দায় একা বসে আছি। নিদ্রিত পুরীতে একলা বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করা পোষাচ্ছিল না। প্রতিদিনের মত সহজভাবে নিরু মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার ছুতোয় আমার বিছানায় এসেছে, আমার আদর সোহাগ হাসিমুখে গ্রহণ করে নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে শান্তভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে। যে সতীনের ছায়ার কল্পনা করে বিচলিত হয়, সেই নিরুর এই রহস্যময় ব্যবহার আমাকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে।

বোধ হয় বিপদের সম্ভাবনার চেয়ে বিপদকে গ্রহণ করা সমুচিত। হয়ত নিরু মনে করেছে, এ নিয়ে গোলমাল করলে লোকচক্ষে মান-সম্মান বজায় থাকবে না। নিরু কি বুদ্ধিমতীর মত মনে করেছে, বিপদকালে ত্যাগ করে যথাসাধ্য রক্ষা করা সমীচিন। নিশ্চয়ই এই শান্ত ভাব বাইরের, মনের মধ্যে তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

১৭

কমলা ফিল্মের স্বত্বাধিকারী শিবনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সার্থকনামা ব্যক্তি। সব কিছুরই তিনি সর্বেসর্বা। তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে দেখছি—"দেখুন ছবির জন্যে বই নিজে না লিখে, ভালো লেখকদের দিয়ে লেখালে একটু খরচ হয়, কিন্তু তাতে জিনিষটা ভালো হয় না কি ?"

"লেখকরা আমার পছন্দমত বই লিখতে রাজি হবেন কি ? যদি কোনও নাম-করা লেখক আমি যেমনটি বলব ঠিক সেই মত বই লিখে দিতে রাজি হন, তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।"

প্রসঙ্গটা অনাবশ্যক দেখে অন্য কথার অবতারণা করলাম—"দেখুন অভিমান ছবিটা একটু অদল-বদল করলে ভালো হয়। শেষের দিকে 'হিরোইন' চোখের জলে ভাসতে-ভাসতে গান করে পিয়ানোর ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়বে—এ দৃশ্য দেখলে লোকের হাসি পাবে না ? আপনি যখন করুণ রসের সৃষ্টি করতে চাইছেন—।"

শিববাবুর ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত হোলো, বুঝলাম তিনি বিরক্ত হয়েছেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে মনের ভাব চেপে হাসিমুখে তিনি বল্লেন—"হাসি পাবে ? দর্শকদের! বইটা যখন দেখানো হবে, দর্শকদের লক্ষ্য করে দেখবেন। পদ্মা যখন পিয়ানোর ওপর মাথা রেখে ডান হাত প্রসারিত করে শুয়ে পড়বে, তখন পিয়ানো আর্ত্তনাদ করে উঠবে তা নইলে অন্তরের ব্যথা দর্শকদের বোঝানোর জন্যে পদ্মাকেই আর্ত্তনাদ করতে হোত। পদ্মার মানে মুকুলিকার যদি আপত্তি থাকে, এই বইটা হয়ে যাওয়ার পর সে আমাদের এখানে আর অভিনয় করবে না।"

মুকুলিকার মনের ভাব অজানা নয়। তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বল্লাম—"সে কোনও কথা বলে নি। যদি বিরক্ত না হন, ছবি সম্বন্ধে দু' চারটি কথা বলতাম।"

"বলুন না। পাঁচজনের মতে কাজ করাই ত আমাদের পেশা।"

"সেই পাঁচজনকে একটু ভালো জিনিষ পরিবেশন করে তাদের রুচি বদলানোর চেষ্টা"—

"অর্থাৎ আপনি বলতে চান, জনসাধারণকে উন্নত করা আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা ত শিক্ষক নই—অন্তত আমি। আমি ছাপোষা মানুষ, আমার ব্যবসাটি যাতে লালবাতি না জ্বালে, শুধু সেইটুকুই দেখে চলি। আমার জ্ঞানও অল্প—"

"সেই কথাই বলছিলাম। ব্যবসার দিক থেকে আপনাকে আদর্শ ব্যবসায়ী বলা যায়। আপনার 'অ্যাসিস্‌ট্যান্ট' কি যেন নাম? তিনিও বেশ ভালো বোঝেন, তাঁর পরামর্শ নিয়ে দেখুন না—অন্তত: একটা ছবিতে।"

শিববাবুর মুখের ভাব কোমল হয়ে গেল—"অমরের কথা বলছেন সে বেশ ভালো বোঝে, নয়? হবে না-ই বা কেন? আমার মত গো-মূর্খ ত নয়। ধারালো ছেলে—সুযোগ অভাবে ফুটতে পেলো না। ও গুন্ গুন্ করে আপত্তি জানায়—পাছে ভালো জিনিষ 'সাপ্লাই' করে সেই ভয়ে পিছিয়ে আছি, নইলে ওকেই প্রযোজক করে আমি সহকারী হতাম।"

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"শুনেছি উনি বড় ঘরের ছেলে, অবস্থার ফেরে—"

"বড় ঘর নিশ্চয়ই, তবে লোকে যে অর্থে বলে সে অর্থে নয়। বংশাবলীক্রমে ওরা সৎ লোক। অমরের বাবা অসুখে পড়ায় তাদের

ব্যবসা ফেল হয়ে গেল। তিনি মারা যাবার সময় আমি ছিলাম, শেষ কথাগুলি ভুলতে পারি না।

'—শিবদা লোকে আমাকে ঠকিয়েছে বলে রাগ করছ? আমি যে কাউকে ঠকাইনি এইটেই সান্ত্বনা নয় কি? ছেলেমেয়েদের জন্যে সহায়সম্পত্তি তেমন কিছু থাকল না, কিন্তু তাদের চরিত্র গঠন হ'য়েছে তারা কষ্ট পাবে না।'—অমরের বাবার কথা মনে হলে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে, লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আমি লোক ঠকাচ্ছি।"

'অভিমান' কথাচিত্রকে মুকুলিকা ব্যঙ্গ করে। তার ধারণাশক্তি, স্মরণশক্তি, সূক্ষ্মরসবোধ, আমাকে মুগ্ধ করে। সুযোগ অভাবে মুকুলিকা ফুটতে পারে না ভেবে ব্যথিত হই।

আমার টাকার অভাব নেই। যদি একটা ফিল্ম কোম্পানী খুলি—শিববাবু উৎসাহ দেন—"খুলুন না একটা মার্জিত ধরণের—অমরকে নিন, মুকুলিকার মধ্যে প্রতিভা আছে,—শিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েরাও যোগ দেবে।"

মুকুলিকা রাজি হয় না—"অমরবাবুকে নিন, আমার মাসতুতো দিদি সেলিনা নামকরা সুন্দরী, তাকেও পেতে পারেন—আমি কাকাবাবুকে ছাড়ব না। আপনি যদি কখনও বিলেত যান আমাকে সঙ্গে নেবেন ত? তখন দিনকতক ছুটি নোব। সেলিনাদি পাঁচবার বিলেত গেছে, তার কথা শুনে আমারও যেতে ইচ্ছে করে।"

এক এক সময় মনে হয় মুকুলিকার হৃদয়বস্তুর অভাব আছে। তার মা মারা গেলে সে বলেছিল—"খুদু মাসী কাঁদছ কেন? মা ত ঠিক সময়েই গেছে, নইলে নিজেও ভুগত, আমাকেও ভোগাত।"

মুকুলিকার মধ্যে ভণ্ডামী নেই দেখে খুশি হই। নিঃসন্দেহে আমি মুকুলিকাকে ভালবেসেছি। তার দোষগুলিকে স্নেহের সঙ্গে মার্জনা করি, গুণগুলিকে বড় করে দেখি। তার মা ছলে ছুতোয় আমার কাছ থেকে আদায়ের চেষ্টায় থাকত, মার অভ্যাস মুকুলিকার মধ্যে গাঁথা হয়ে গেছে। যে অর্থলোলুপতার জন্য মুকুলিকার মাকে ঘৃণা করতাম, মুকুলিকার ক্ষেত্রে মনে হয়—বেচারী বঞ্চিত জীব।

নিজের প্রয়োজনে মুকুলিকার ঘরের পাশে আর একখানি বড় ঘর তৈরী করে ঘর দু'খানি দামী আসবাবে সাজিয়ে নিয়েছি। আমার মন সর্ব্বদাই এই ঘর দু'খানিতে মুকুলিকার আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়। ঘরে আত্মীয়-স্বজন প্রিয় পরিজনদের মাঝখান থেকে, অফিসের কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্য থেকে খসে পড়বার সুযোগ খুঁজি, যখন-তখন মুকুলিকার ঘরে উদয় হই।

কখন দেখি ছাতে আমার কেনা মার্বেল পাথরের চৌকীর ওপর বসে আছে, পিঠ ভরা কালো চুল, কোলের ওপর স্থানীয় লাইব্রেরী থেকে পানওয়ালার ছেলেকে দিয়ে আনানো বই, পাশে ছোট পাথর বাটিতে তেঁতুল মাখা। কখন দেখি যে খুদু মাসীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাটিভরা তরকারী নিয়ে গব্‌গব করে খাচ্ছে। কখন তাকে দোতলার এক নম্বর ভাড়াটে সোনাকে সহায় করে দু' নম্বর ভাড়াটে আশমানিকে নাস্তানাবুদ করতে দেখি, তখন তার কথাবার্ত্তা অশ্লীলতা ঘেঁসা, হাসি অশোভন রকমের উচ্চ। এই রাক্ষসী কি গুণ নিয়ে আমাকে এতখানি আকর্ষণ করে? তবু আমার কাছে সে প্রাণরসে উচ্ছল জীবন্ত প্রতিমা!

মুকুলিকার লুব্ধতা আমাকে ব্যথিত করে। মনে ভাবি অযাচিত

ভাবে প্রচুর পেলে তার এ দোষ সেরে যাবে। দোকানে দোকানে ঘুরে দামী এক সেট মুক্তোর গহনা কিনে এনে তাকে বল্লাম—"একটা ম্যাজিক দেখাব। তোমার ফিকে গোলাপী বেনারসী,—যেটার গায়ে ফুল নেই সেইটা পরে এসো, সেই সঙ্গে নতুন জর্জেটের ব্লাউসগুলোর মধ্যে লালচে ধরণের ব্লাউসটা।"

আমার নির্দ্দেশমত সাজ-সজ্জা করে এলে তার চোখ শক্ত করে বেঁধে একে একে পুরোন গয়নাগুলি খুলে নতুন গয়না পরিয়ে দিয়ে—তাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে চোখের রুমাল খুলে দিলাম। তার দিকে চেয়ে গর্ব্বে আনন্দে মন ভরে উঠল, সে যেন আমারই আঁকা একখানি ছবি।

মুকুলিকার খুশি-ভরা হাসি-মুখ কৃতজ্ঞতা মাখান উজ্জ্বল চাহনি, পরম সম্পদের মত মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকল।

আমাকে সে ভালবাসে কি না বুঝতে পারি না, জিজ্ঞেস করতে আমার লজ্জা করে, কারণ ভালবাসা জিনিষটাই তার কাছে বিদ্রূপের বস্তু। খুদু মাসীর স্নেহের অন্ত নেই, সোনাদি, আশ্‌মানি ওরাও ওকে ভালবাসে, সেই কথা বলতে মুকুলিকা তার আঙ্গুরেব মত সরস, ফুলের পাপ্‌ড়ির মত কোমল, গোলাপী ঠোঁট উলটে বল্লে—"ভালবাসা না ছাই! মাকেও ত ওরা অমনি করত, বাড়ীওলিদের খোসামোদ করে চলতে হয়।"

খুশি হলে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, হাসি পেলে সে আমার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ে, সে যে আমার কাছ থেকে দূরে থাকে না তাইতেই আমি কৃতার্থ। তিনতলার খাটে বই হাতে বসে আছি, তার হাসির সঙ্গে কথার আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে আসছে—"সোনাদি

আজ তোর পালা, আজ আমি আশ্‌মানির দলে। হাঁগো খুড়ু মাসী কাল তোমার আলুর দম খেয়ে খুড়ু মেসো কি বল্ল? কিছু বলেনি? আচ্ছা বে-রসিক মেসো ত! অমন মেসোকে তালাক দিয়ে দাও।"

ইচ্ছে হলে সে আমার কাছে আসে, তাকে কোনও রকম বাধ্য-বাধকতার মধ্যে ফেলিনি। ডেকে পাঠাতে সে দুমদুম্ করে ঘরে এসে বল্লে—"একটু জল খাবেন, তার জন্যে এত ডাকাডাকি! ঐ তো কুঁজো গেলাস রয়েছে,—আসুন জল গড়াতে শিখিয়ে দি, এমনি করে বাঁ হাতে গেলাস ধরে ডান হাতে কুঁজোর গলা ধরে জল ঢেলে নিয়ে ঢুকঢুক্ করে খেয়ে ফেলুন, এইবার বাকি জলটা জানলা দিয়ে ছাদে ফেলে দিন, তারপর যেমন বলেছি ঠিক তেমনি করে একটু জল ঢেলে নিয়ে গেলাস ধুয়ে ফেলে কুঁজোর মুখে ঢাকা দিয়ে রাখুন। এইবার দেখুন ত হাত দুটো ঠিক আছে, না ক্ষয়ে গেছে?"

হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম—"এই ত এখানটা একটু ক্ষয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।"

"অমন হাত থাকা না থাকা সমান।"

আমার দুধের মত সাদা সুন্দর হাত মুকুলিকার মনে ছাপ ফেলতে সক্ষম নয়। মনের নিভৃত কোণ থেকে অভাববোধ মাথা তুলতে চায়, জোর করে তাকে দাবিয়ে রাখি।

হালকা-হাওয়ার প্রজাপতি আমার! অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের কর্ত্তব্যবোধ, ভবিষ্যতের ভাবনা যেন কোনও দিন তোমার ডানাকে ভারী করতে না পারে।

সকাল থেকে একলাই বসে আছি, বোধ হয় সারা জীবন এই ভাবে বসে থাকতে পারি। ঘড়িতে এগারোটা বাজল, এইবার বিদায়

নেবার জন্যে মুকুলিকাকে ডাকতে হবে। শুনেছি শেফালী বল্লে সে রাগ করে, রাগ করে সে কি বলে শোনবার জন্যে সিঁড়ির ওপর থেকে ডাকলাম—"শেফালী ও শেফালী।"

ঝড়ের গতিতে ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাতে আমার মুখ চেপে ধরল—"সর্ব্বনাশ! ঐ আশমানি মুখপুড়ি নতুন ভাড়াটে, সে শেফালী নাম জানে না। দুটি পায়ে পড়ি শেফালী বলবেন না। শেফালী বললেনই বা কেন? মুকুলিকা যদি আমার নাম না হয়, শেফালিকাও আমার নাম নয়। আমার আসল নাম যদি শুনতে চান—তিন সত্যি করুন, আমাকে ছুঁয়ে শপথ করুন শেফালী বলবেন না।"

যথারীতি শপথ গ্রহণ করা হলে সে বল্লে—"মার অনেকগুলো মরে মরে তারপর আমি, তাই আমার নাম ফেলী। বড় হলে ফেলীকে ফালি করে সামনে একটা শে লাগিয়ে নেওয়া হয়েছে।"

তাকে কাছে টেনে কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বল্লাম—"ফেলি ডার্লিং তোমাকে বিলেত নিয়ে যেতে পারবো কি না বলতে পাচ্ছি না, তবে তোমাকে না নিয়ে বিলেত যাবো না।"

মুকুলিকা ছলে-ছুতোয় তার মাসতুতো দিদি সেলিনার রক্ষাকর্ত্তা মিষ্টার বাট্‌লীওয়ালার প্রশংসা ক'রে আমাকে উত্তেজিত করতে চায়। বাট্‌লিওয়ালা অকৃপণ, তিনি ঘরকুনো নন। সৌভাগ্যবতী সেলিনা কত সুন্দর সুন্দর দেশ দেখেছে, তার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে মুকুলিকার নাকি হাড় জ্বালা করে।

আমি কি কোনও দিন লোকনিন্দাকে তুচ্ছ করে মুকুলিকাকে নিয়ে দেশ-বিদেশের লোকের সামনে ঘুরে বেড়াতে পারবো?

বিলিতি মদের বোতল আমার মামার বাড়ীকে নির্বংশ, বাবার মামার বাড়ীকে সর্বস্বান্ত করেছে, নইলে নেশা করে দেখতাম লোক-নিন্দাকে তুচ্ছ করা যায় কি না। কেউ যদি সহজভাবে কুশল-প্রশ্ন করবে, মনে হয় তার প্রশ্নের মধ্যে আমার চরিত্র-সম্বন্ধে ইঙ্গিত নেই ত! বন্ধুরা অভ্যাস অনুযায়ী বলেন—"আজকাল অজয়কে বেশ ভালো দেখছি।" তাঁদের কথার মধ্যে মানে আছে মনে করে কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে। আত্মীয়রা যদি বলেন—"তোমাকে তেমন ভালো দেখাচ্ছে না শরীরের যত্ন নাও।"—মনে মনে চমকে উঠে ভাবি ওঁরা হয়ত আমাকে সৎপথে থাকবার উপদেশ দিচ্ছেন। লোকনিন্দাকে তুচ্ছ করা সহজ নয় বলেই বোধ করি সমাজ-চক্ষের অপরাধীরা নেশায় ডুবে থাকে।

নিরুর দিকে চেয়ে নিজেকে অপরাধী মনে হয়—তার কণ্ঠার হাড় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, চোখের কোলে কালির রেখা। ছোটঠানদি বোধ হয় ব্যাপারটা জানেন, তা নইলে আমাকে শুনিয়ে বলার মানে কি?—"নাতবৌ, তুই বড্ড ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিস, দিন কতক হাওয়া বদলে আয়।"

নিরু রাগ করে বলে—"কথায় কথায় হাওয়া বদলালে চলে না। ছোট খোকাটার দাঁত উঠ্‌ছে, রাত্রে কাঁদে, তাই একটু রোগা হয়ে যাচ্ছি।" আমার দিকে চেয়ে সে কথাটা শেষ করে—"ডাক্তার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা টনিকের ব্যবস্থা করে দিও।"

ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করি, নিরু হাসিমুখে চেয়ে চেয়ে দেখে।

তার ব্যবহারে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। সে আমার গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করে না, আমার কাছে তার বোধ হয় কোনও দাবী-দাওয়া নেই, দাম্পত্য স্বর্গচ্যুত আমাকে সে বোধ হয় অনুকম্পার চোখে দেখে, সেইজন্যে তার কাছে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না।

চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে অফিসের একঘেয়ে কাজে লাগান অসম্ভব। আমাদের ঘরোয়া অফিসে নিয়ম-কানুনের বাঁধাবাঁধি নেই। দয়াল বাবুর ছেলে গুণগুণ করে গান করছিল—'অভিমান'-কথাচিত্রে মুকুলিকার গাওয়া একঘেয়ে কাঁদুনে সুরের গান। ইতিমধ্যে আমার আপত্তিকর "এ জীবনে আমি তোমারি প্রিয়, আর কারো নয় কারো নয়" গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে পথে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়েছে। দয়াল বাবুর ছেলে নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি, আমাকে বিদ্রূপ করবার সাহস তার হবে কি! কিন্তু বেশ বুঝতে পারি আমাকে অসময়ে অফিস থেকে চলে যেতে দেখলে ওরা মুখ টেপাটিপি করে হাসাহাসি করে।

মুকুলিকার বাড়ীতে আমার খাতির আছে, আমাকে দেখলে সেখানকার ভাড়াটে মেয়েদের ঘরের মাতাল অতিথিদের নেশা সাময়িকভাবে ফিকে হয়ে যায়, খুড়ুর ঘরের বৃদ্ধ ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, মেয়েরা মাথায় কাপড় টেনে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেখানকার চোখে আমি সম্ভ্রান্ত মাননীয় ব্যক্তি, সেইজন্য সেখানে নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা, সহজভাবে পডাশোনা করায় বাধে না।

মুকুলিকা পড়তে ভালোবাসে, তাকে বই জোগানোর ভার সানন্দে গ্রহণ করেছি। অত্যন্ত দ্রুতভাবে সে শিক্ষিত মার্জিত হয়ে উঠছে, তার নীহারিকার মত তরল বুদ্ধি আকার ধারণ করছে, সে দিনে দিনে

সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে উঠছে, তবু তাকে নিয়ে আমার তৃপ্তি নেই। আমার অসুখ করলে যার চোখে-মুখে আশঙ্কার ভাব ফোটে না, যার কাছে আমার যাওয়া-আসা সমান, তাকেই আমি ভালোবাসি।

দিনের উজ্জ্বল আলোয় তার সঙ্গে দেখা হয়। সে আমাকে তার রূপ-যৌবনের ক্রেতা হিসেবেই দেখে, আমার অন্য পরিচয় তার অজ্ঞাত। আমার প্রচুর ঐশ্বর্যের সামান্য অংশ ছাড়া তাকে কি-ই বা দিতে পেরেছি! আজকাল সে শাড়ী-গহনায় বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছে, তার মত কোথাও যখন যাবার সুবিধে নেই তখন অনর্থক কতকগুলো বোঝা বাড়াবার কি দরকার! আমি সাবধানী পথিক—আমার মধ্যে সে মনোমুগ্ধকর কিছুই খুঁজে পায়নি—সে যে ভালোবাসতে শেখেনি, আমার অক্ষমতাই তার জন্যে দায়ী।

বিবাহ উপলক্ষে নিরু দিনকতকের জন্যে বাপের বাড়ী গেছে, এই রাত্রে বাড়ী না ফিরলেও ক্ষতি নেই।

ঘড়ির কাঁটা বিকেলের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ভালভাবে স্নান করে, সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরে তৈরী হয়ে ওভারকোট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মুকুলিকার হালকা গরম কাপড়চোপড়গুলি শীতের রাত্রে গঙ্গার ধারে বসে থাকবার উপযোগী নয়। আজ প্রথম মুকুলিকা আমার সঙ্গে সওদা করতে বেরোবে। খাওয়ার ব্যাপারটা হোটেলে চুকিয়ে নেব, আজ একটু মিষ্টি গোলাপী নেশা করতে আপত্তি কি!

গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে মুকুলিকাকে বলব—শালের রুমালটা মাথায় বাঁধার জন্যে তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে, তুমি যেন বিলিতি ফিল্মের একটি উজ্জ্বল তারকা। মুকুলিকার শৈশব যাই-যাই করেও

যেতে পারেনি,—তার মত বালিকাস্বভাবের তরুণীরা এ রকম কথা শুনলে খুশি হয়। আজ আকাশে চাঁদ নেই, ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকারে নিজেকে ব্যক্ত করা সহজ, আমার সমস্ত শক্তি ব্যয় করে মুকুলিকার সামনে কাব্যলোকের যবনিকা তুলে ধরব।

দোতলা থেকেই গানের স্থর শুনতে পেলাম, স্থর মুকুলিকার ঘর থেকে ভেসে আসছে, শিক্ষিত মধুর গলায় ঠুংরির তান। সিঁড়ি থেকে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে কালো মখমলের নাগরাই চটি পরা ছোট সাদা তু'খানি পা দেখা যাচ্ছে। শুনেছি সেলিনার সঙ্গে বাটলীওলার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ায় সম্প্রতি সেলিনা বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসে গ্রাণ্ড হোটেলে বাস করছে,—এ নিশ্চয়ই সেলিনা!

সেলিনার উপস্থিতিতে আমার উদ্দেশ্য পণ্ড হবে না ত? সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিরুৎসাহ মনে চিন্তা করতে লাগলাম। চিন্তায় মগ্ন থাকায় কখন গানের স্থর থেমে গেছে, কখন সেলিনা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ওপরকার ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি, গলার স্বরে চমক লাগল। নীলপর্দার পটভূমিকার সামনে শুভ্রবসনা সেলিনার ছবি। এই রকম রূপ দেখেই সেকালের কবিরা স্থির সৌদামিনীর কল্পনা করেছিলেন। সেলিনা প্রশ্ন করলে—"মাপ করবেন মিষ্টার মিত্র, মুকুলিকা কোথায় গেছে বলতে পারেন কি? তার ত যাবার কোনও জায়গা নেই বলেই জানি, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি, মনে করেছিলাম আপনার সঙ্গেই গেছে—"

মুকুলিকা বাড়ী নেই! ফোনে তাকে সন্ধ্যার সময় কাপড় পরে তৈরী হয়ে থাকতে বলেছিলাম! সেলিনার কথার উত্তর দেওয়ার বিষয় মনে থাকল না। অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে

প্রশ্ন করলাম—"কোথায় গেল মুকুলিকা! কখন ফিরবে? তার ত যাবার কোনও জায়গা নেই বলেই জানি।"

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেলিনা খিল খিল করে হেসে উঠল—"আমায় মাপ করবেন মিষ্টার মিত্র, না হেসে থাকতে পারছি না। আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনার কাছে অন্য রকম আশা করেছিলাম এখন দেখছি মুকুলিকাকে হারালে আপনি লোটা-কম্বল সম্বল করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। আসুন ঘরের মধ্যে, সে এখুনি ফিরে আসবে।"

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় সেলিনাকে দেখলাম, সৌন্দর্য্যের খ্যাতি আগেই শোনা ছিল। শুনেছি তাকে কিনতে মুকুলিকার মাসীর অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছিল। শুনে শুনে যে রকম ধারণা করে রেখে-ছিলাম, সেলিনা তার চেয়েও সুন্দরী। সাজসজ্জার হাজার রকম কারিগরিতে এ রকম নিখুঁৎ গড়ন, কাগজি বাদামের মত মুখের ছাঁচ, অষ্টমীর চাঁদের মত কপাল, তিলফুলের মত নাক পাওয়া যায় না। সাদা জর্জ্জেটের পাড়বিহীন শাড়ী, কুঁচি-দেওয়া সাদা জামা, তলায় লেশ, শুভ্র কোমল দেহের সামান্য আভাস।

সোফার ওপর কালো 'ফারে'র কোট পড়ে রয়েছে, তা ছাড়া সেলিনার গায়ে কোন রকম গরম কাপড় নেই। ঐ রকম একটি কোট মুকুলিকাকে কিনে দেব মনে করেছিলাম। আমার কল্পনার সন্ধ্যাটি ব্যর্থ হয়ে গেল।

সুর্মা-পরা কালো চোখে বিলোল কটাক্ষ করে কণ্ঠস্বরে মধু ঢেলে সেলিনা বললে—"দেখুন আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। পেরেছেন? কি করে চিনলেন?

মুকুলিকার কাছে শুনে শুনে? দিন চারেক আগে একদিন এসে সারারাত মুকুলিকার কাছে ছিলাম, সে দিন আমিও আপনার বিষয় অনেক শুনেছি, আপনার একটা ফটোও নিয়ে গেছি সে দিন, সেই ফটোটি আমার ড্রেসিং টেবিলের ওপর বিরাজ করছেন। হাসছেন! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? চলুন আমার সঙ্গে। আচ্ছা সে কথা যাক, আমার বিষয় কি শুনেছেন বলুন ত।"

"শুনেছি বাড়ী বিক্রীর উদ্দেশ্যে আপনি কলকাতায় এসেছেন।"

"বাড়ী বিক্রীর উদ্দেশ্যটা গৌণ। মিষ্টার বাট্‌লীওলার সঙ্গে বন্ধুভাবে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেছে শোনেন নি? ছোট্ট থেকেই তাঁর কাছে ছিলাম, একটা দামী রত্নের মত তিনি আমাকে সাবধানে সযত্নে চোখে-চোখে রেখেছিলেন। ওস্তাদ রেখে গান, মেম রেখে লেখাপড়া তিনিই শিখিয়েছেন। তাঁর দৌলতে টাকাপয়সার অভাব নেই, বারো বৎসর হাজার টাকা করে মাসোহারা পেয়েছি, পালিতা মাও যথেষ্ট দিয়ে গেছেন—সব মিলিয়ে স্থদে-আসলে ব্যাঙ্কে দু'লাখ টাকা মজুত। টাকাকড়ির স্পৃহা আর নেই। বাট্‌লীওলার বড় মেয়ের বড় মেয়েটি প্রায় আমার সমবয়সী। তা হলেই বুঝুন শিক্ষিত সুন্দর একজনকে পাওয়ার ইচ্ছে আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয় কি?"

নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলাম—"এ সব ব্যক্তিগত ব্যাপারে কি মতামত দোব বুঝতে পারছি না।"

সেলিনার মুখ লাল হয়ে উঠল, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সে বল্লে—"মুকুলিকা আমার বোন, তার সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার আমার আছে। ধরুন সে আপনার কাছে আর ফিরে এলো না, তখন আপনি কি করবেন?"

হো হো করে হেসে উত্তর দিলাম—"কিন্তু তিনি আপনার কাছে ফিরে এসেছেন, নিচে গলার আওয়াজ পাচ্ছি।"

পাতলা ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি মাখিয়ে সেলিনা বললে—"এসেছেন না কি? এলেই ভালো! এখন আমার কোটটা একটু ধরুন, আমি যাই। এই আমার কার্ড রাখুন, আমাদের লজ্জা করলে চলে না, আমাকে উপযাচিকা সেলিনা বলেই জানবেন।"

কোট পরা হয়ে গেলে সে নিচে নেমে গেল। সিঁড়িতে মুকুলিকার পায়ের শব্দ, সেলিনার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম—"ধন্যি কপাল করেছিলি ফেলি! সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যর্থ হোলো।"

মুকুলিকা চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠল—"কি করছ! চেঁচাচ্ছ কেন? শুনতে পাবে যে।"

সিঁড়িতে দুই বোনের চুপি চুপি কথা। সাপের আওয়াজের মত হিস্ হিস্ ফিস্ ফিস্ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বুঝলাম সেলিনাকে ঘরে রেখে মুকুলিকা চলে গিয়েছিল—কিন্তু কেন?

কতকগুলি বিস্মৃত অর্দ্ধ-বিস্মৃত কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেলো। অল্প দিন আগেকার যে সব ঘটনা মনের মধ্যে কোনও ছাপ না রেখে মন থেকে মুছে গিয়েছিল, সেই সব ঘটনাবলীর খণ্ডাংশ মিলিত হয়ে যে রূপ ধারণ করল সে রূপ সংশয়ের—সন্দেহের।

মধ্যযুগে এই সব কালনাগিনীদের কুকুর দিয়ে খাওয়ান হোত। ঠাণ্ডা জল খেয়ে, চোখে-মুখে জল দিয়ে উত্তেজনাকে প্রশমিত করলাম। পাইপ মুখে দিয়ে শান্তভাবে প্রতীক্ষা করছি, কি কৈফিয়ৎ দেয় দেখি, তারপর সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে যাব।

সেলিনাকে বিদায় দিয়ে মুকুলিকা ঘরে ফিরে এলো। তার পরণে পাড়-ওঠা সস্তা তাঁতের শাড়ী, এ রকম শাড়ী তার আছে বলে জানতাম না, গায়ে খয়েরী রংয়ের র‍্যাপার। র‍্যাপারখানা মুকুলিকার মাকে ব্যবহার করতে দেখেছি। শান্তভাবে প্রশ্ন করলাম—"ছুটিতে অমর বাবু বাড়ী যাননি? তাঁকে শেয়ালদার মোড়ে আপেল কিনতে দেখলাম।"

মুকুলিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—"আপেল কিনতে দেখলেন অমরকে? সত্যি।"

"তাই ত দেখলাম, কিন্তু তাতে খুশি হবার কি আছে? তোমার জন্যেই কি আপেল কেনা?"

"আমার জন্যে আপেল সে কেন কিনবে! খুশি হলাম কেন? কাকাবাবু শুনলে আরও ঢের বেশি খুশি হতেন। ডাক্তার অমরকে আপেল ইত্যাদি অনেক কিছু খেতে বলায় কাকাবাবু পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে অমরকে ছুটিতে দেশে না গিয়ে শরীর সারাতে অনুরোধ করেছেন, তাঁর মনে ভয় ছিল, অমর কথা না শুনে নিজেদের গ্রামে যাবে আর এসে টাকা ক'টা ফিরিয়ে দেবে। আরও একবার নাকি এই

রকম হয়েছিল। কাকাবাবু টাকা দিয়ে হাওয়াবদলাতে পাহাড়ে পাঠিয়েছিলেন, শরীর সারিয়ে অমর ফিরে এলো ; সকলে পাহাড়ী-হাওয়ার উপকারিতার তারিফ করছে, অমর টেবিলের ওপর টাকাগুলি রেখে বল্লে : 'দেশেই গিয়েছিলাম, মা'র যত্নে শরীর সেরেছে'।"

"লোকের সহানুভূতি উদ্রেক করবার জন্যেই কি অমর বাবু এত ভোগেন ?"

মুকুলিকার চোখ জলে ভরে গেল, বল্লে—"তার কত কাজ, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় কোথায় ! কাকাবাবু টিউশানি ছাড়াবার জন্যে মাইনে বাড়িয়ে দিতে চান, অমর রাজি হয় না, বলে : 'সংসার চালানোর জন্যে কঠিন পরিশ্রম কি একলা আমিই করছি ?' তা ছাড়া বস্তির উন্নতি, গরীবদের লেখাপড়া শেখানো—"

"অমর-অমর করছ কেন ? তুমি কি অমরের ঠাকুমা ?"

"অমর বাবু বল্লে দরওয়ান তেড়ে মারতে আসে, বলে : 'অমর ভাইয়া যদি বাবু হয়, তা হলে আমিও বাবু। দুজনেরই খাদির কাপড়, দেশী চামড়ার জুতো। একই জোড়ার পেতলের থালায় দুজনের একই রকম খানা, পাশাপাশি দুখানা খাটিয়ায় দুজনে শুই, অমর ভাইয়া গান্ধী মহারাজের চেলা'।—"

"অমর মহারাজের কাহিনী শোনবার মত পর্য্যাপ্ত সময় আমার নেই। কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? দীপিতা দেবীর বাড়ী ! হঠাৎ ? তাঁর সাথে ত সাপে-নেউলের সম্বন্ধ ছিল বলেই জানি।"

"সে আগে ছিল, এখন দীপিতা দেবীকে দিদি বলে ডাকি, তিনি আমাকে ছোট বোনের মত—"

"হঠাৎ এত দয়ার কারণ ?"

"কারণ শুনতে হলে অমরের কাহিনীই শুনতে হয়, তার একটি কথাতে দিদি বদলে গেছে। কথায় কথায় একদিন বলেছিলাম—দীপিতা দেবীর ব্যবহার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে আপনারা আমাকে ঘৃণা করেন। শুনে অমর দিদির কাছে জানতে চাইল, তিনি আমাকে কেন ঘৃণা করেন। দিদি কেঁদে কেটে আমাকে বুকে জড়িয়ে, আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে অস্থির—"

"আমি আসবো জেনে, আমাকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ দিদির বাড়ী না গেলেই কি চলত না?"

"দিদির স্বামীর অসুখ তাই গিয়েছিলাম। আপনাকে একলা রেখে ত যাইনি, গেলেই পারতেন দুজনে বেড়াতে।"

"আমার জন্যে সেলিনাকে তুমিই আনিয়ে রেখেছিলে? এত কাণ্ড করে কেউ দিদির বাড়ী যায় না! মিথ্যা কথা এ থেকেই ধরা পড়ছে।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার! দিদির বাড়ী যাইনি ত কোথায় গিয়েছিলাম?"

"কোথায় গিয়েছিলাম জেরা করে জানবো। কার কাছে গিয়েছিলে বুঝতে পেরেছি—"

"বংশী মামার সঙ্গে গিয়েছিলাম, তাকে ডেকে জানুন।"

"বংশী মামা? সেই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির?"

"বংশী মামাকে ঘৃণা করা আপনার শোভা পায় না। দিদির কাছে গেলেই জানতে পারবেন।"

"দিদি? ভদ্রঘরের যে মেয়েটা শ্রীরাধা সেজে আলুথালু হয়ে দৌড়চ্ছিল?"

"দিদিকেও ঘৃণা করেন? বেচারী দিদির স্বামীর হাঁপানি—কত কষ্ট! জামাইবাবু কত ভালো লোক—দুজনের কত ভালবাসা!"

"তুমি ছেলেমানুষ, এখন কিছু বুঝতে পারছ না, তোমাকে ফাঁদে ফেলে টাকাকড়ি হাত করবার ষড়যন্ত্র চলছে। দারিদ্র্য থেকে উঞ্ছবৃত্তির জন্ম! তোমার অমরটি পয়লা নম্বরের ধূর্ত্ত, সস্তার ভড়ং রপ্ত করে সাধু সেজে থাকে। তুমি তার শ্রীমুখের দিকে ড্যাব্ডেবিয়ে চেয়ে থাক, শ্রীমুখের বাণীকে বেদবাক্য মনে কর—আমি দেখেও গ্রাহ্য করি না। আমাকে বোকা বুঝিও না, তুমি দরওয়ানের বস্তিতে অভিসারে গিয়েছিলে।"

মুকুলিকা আসন ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, রাগে, অপমানে সে যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। তার চোখে, মুখে, সর্ব্বাঙ্গে ঘৃণার অভিব্যক্তি। থরথরে কাঁপা গলায় সে বল্লে—"যদি দেশ স্বাধীন হয়—যদি আমি রাণী হই, আপনাকে, আপনার মত আর সকলকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলিয়ে দোব, পৃথিবী হাল্কা হবে।"

অভিমানে আমার চোখের কোলে জল বুঝি এসে পড়ল, কোনও রকমে সামলে নিয়ে বল্লাম—"তোমার সেই ছোরাটা, বংশপরম্পরায় যেটা তোমাদের বালিশের তলায় থাকে, সেইটে নিয়ে চেষ্টা করে দেখ না।"

বিদ্রূপের হাসি হেসে মুকুলিকা বল্লে—"না যে সতীলক্ষ্মী মাছ-ভাত খেতে পেয়েই খুশি—তাঁকে বঞ্চিত করে পাপ সঞ্চয়ের ইচ্ছে নেই।"

নিরুকে নিয়ে মুকুলিকার এই বিদ্রূপ অসহ্য! আমার শিরা-উপশিরায় আগুনের স্রোত ব'য়ে গেল! সমগ্র শক্তিকে একত্রিত করে মুকুলিকার মুখে আঘাত করলাম, সে ঘুরে পড়ে গেল। চলে

আসতে আসতে জানিয়ে এলাম—"তোমার অমরকে আমি গুণ্ডা দিয়ে এমন প্রহার দোব, যে সে ছ মাসের জন্যে বিছানা নেবে।"

অন্তরের শূন্যতার সঙ্গে বাড়ীর সামঞ্জস্য থাকায় খানিকটা আরাম অনুভব করছি। মনের এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের গোলমাল সহ্য হোত না। নিরুর কালো চোখের উদ্বেগমাখা দৃষ্টিকে কি করে এড়িয়ে চলতাম? না খাওয়ার কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেয়ে থালার সামনে বসা সহজ। মুকুলিকার ঘৃণাভরা দৃষ্টি, বিদ্রূপের হাসিতে আচ্ছন্ন হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করে চলেছি—দিন কেটে যাচ্ছে।

আমার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই সেলিনাকে আমার স্কন্ধে চাপানোর চেষ্টা। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে, মুকুলিকার সঙ্গে অমর, দীপিতা নিঃসন্দেহে জড়িত। কমলা ফিলিমের সরকারী কাকাবাবু শিবনাথ সর্ব্বাধিকারীর কোনও অংশ আছে কি না কে জানে। মুকুলিকাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে হলে মিষ্টি ব্যবহারের ফাঁদ পেতে তাকে বশ করতে হয়। মুকুলিকাকে ভেসে যেতে দেওয়া আমার উচিত হবে কি? ম্যালেরিয়া জীর্ণ সেই কাঁকলাশ মূর্ত্তি অমর মুকুলিকার প্রেমপাত্র!

মুকুলিকার অপরাধের বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া গেছে কি? হয় ত লোকসমাজে মেশবার সহজ-প্রবৃত্তিতেই মুকুলিকা দীপিতাদের বাড়ী গিয়েছিল, সরল বুদ্ধিতেই তার সেলিনাকে আমার জন্যে রেখে যাওয়া। সে আমাকে চেনে না, আমাকে চেনাবার সুযোগ আর পাওয়া যাবে না, তার কাছে যাবার পথ আমি নিজের হাতে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছি।

পৃথিবীতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই! টুং টুং—টেলিফোনের ঘণ্টা.—মুকুলিকার আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠের আহ্বান! আবার মুকুলিকার সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পাওয়া গেল। সুন্দরভাবে সাজ করে মুকুলিকা আমার প্রতীক্ষা করছে। তার মুখে আমার দেওয়া আঘাতের চিহ্ন এখনও মিলিয়ে যায় নি। অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে গেলাম, বাধা দিয়ে সে আমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বল্লে—"আমার দোষেই ত আপনাব মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, আর কখনও এমন হবে না।"

মুকুলিকাকে ঠিকমত বুঝতে পারছি না, যত্ন-লালিতাকে ঝড়-ঝাপ্‌টা কখনও সহ্য করতে হয়নি, প্রথম আঘাতেই কি সে এতখানি বদলে গেছে? সাজসজ্জার অন্তরালের উদাসিনী, হুকুম তামিল করবার এই কলের পুতুলটিকে নিয়ে আমি কি করব! একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের বক্তব্যকে গুছিয়ে নিয়ে বল্লাম—"আমাকে সব কিছু খুলে বল্লে সব দিক থেকেই ভালো হবে।"

মুকুলিকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—"কি জানতে চাইছেন?"

"আমাকে চাও না বলেই কি সেলিনাকে আনিয়ে রেখেছিলে?"

মুকুলিকা ঘাড় হেঁট করে রইল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ঠেলে ঠেলে উঠতে চায়—কোনও রকমে রোধ করে বল্লাম—"বিতৃষ্ণার কারণ কি, জানতে পারি কি? কি দরকার ছিল সেলিনাকে আনবার—আমাকে জানালেই আমি আর আসতাম না।"

সজলচক্ষে মুকুলিকা উত্তর দিল—"আমার বোকামিকে ক্ষমা করুন। অযোগ্য আমার প্রতি আপনার কত ভালবাসা। দিদির সঙ্গে পরিচয় হবার পর এ জীবন আর ভালো লাগছে না।"

এতক্ষণে একটা পথ পাওয়া গেল, বল্লাম—"এস, দুজনে বিয়ে করি।"

মুকুলিকা যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, তার চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে গভীর হতাশা—"বিয়ে করবেন আমাকে? আচ্ছা।"

হাসবার চেষ্টা করে বল্লাম—"দাঁড়াও আগে পাত্রী সম্বন্ধে খোঁজ নি—তবে ত বিয়ে। আমার অনুরোধে তুমি সত্য কথা খুলে বল।"

মুকুলিকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—"এখন থেকে কোনও দিন সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না। কি জানতে চাইছেন?"

"অমরের সঙ্গে কতদিনের ভালবাসাবাসি?"

"সে আমি নিজেও ঠিক জানি না। সেই দিনের ঝগড়ায় বুঝতে পারলাম অমরের নিন্দে সহ্য করতে পারি না। গুণ্ডার কথা শুনে অমরের বিপদের আশঙ্কায় সারারাত ছটফট করে কাটিয়েছি।"—বলতে বলতে তার মুখে গোলাপী আভা দেখা দিল, সে মাথা নিচু করে লজ্জা-মাখা মিষ্টি গলায় বল্লে—"আপনার কথা শুনে সেই দিনই প্রথম মনে হোল তার কাছে অভিসারে যাওয়ার চেষ্টা কেনই বা করবো না!"

"বুঝলাম, কিন্তু আমাকে ডেকে আবার জড়াবার কি দরকার ছিল?"

"অপেক্ষা করুন, খুলে বলছি। এ ক'দিন দিদির বাড়ী ছিলাম। অমরকে ডেকে পাঠিয়ে সকলে মিলে কাকাবাবুর কাছে গেলাম। আমার টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী সব অনাথ আশ্রমকে দিয়েছি, এখন থেকে আমিও গরীব। আপনার কাছে পরবো বলে শাড়ী-গহনাগুলো রাখা। যত দিন আপনার মন আমার ওপর থাকবে, তত দিন আমি আপনার দাসী।"

"পাগলামীর চরম! দেহে একজন মনে একজন—এ কেমন নীতি?"

"অমরের মতে সব সময়ে সকলের নীতি এক হতে পারে না। আমি ইচ্ছা করে আপনার মনে ক্ষুধা জাগিয়েছি, আপনাকে তৃপ্ত রাখার দায়িত্ব আমার।"

"অমরের নিন্দে তোমার সহ্য হবে না জেনেও না বলে থাকতে পারছি না 'গাছের খাওয়া, তলার কুড়ান' বলে একটা প্রবাদবাক্য আছে। অমরের উচিত তোমাকে বিয়ে করা।"

"কাকাবাবু সে প্রস্তাব করেছিলেন, উত্তরে অমর আমার কাছে চিঠি দিয়েছে। আমাকে চাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষ পশুর চেয়ে অনেক বড়—তাকে বিবেচনা করে চলতে হয়। আপনাকে নিয়ে সমস্যা ত আছেই, তা' ছাড়া আমার জন্যে সম্মানের স্থান সংগ্রহ করতে সক্ষম না হলে সে আমার সংস্পর্শে আসবে না। এ কি, আপনি চলে যাচ্ছেন? কি সর্ব্বনাশ! এ আমি কি করলাম, অমরের কাছে কি করে মুখ দেখাব।"

মুকুলিকা দু' হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। তার সাজসজ্জা অবিকল শ্রীরাধার প্রধানা সখীর মত। মাথায় ফুল, দীর্ঘ বেণীর প্রান্তে মুক্তাখচিত রেশমী খোঁপা, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার।

হাত ছাড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বল্লাম—"আমারও ত বিবেচনা করবার কিছু থাকতে পারে। এর পর তোমাদের মিলনে কোনও বাধা রইল না।"

হাত জোড় করে মিনতি-মাখা স্বরে মুকুলিকা বল্লে—"অমরকে

ভুল বুঝেছেন—তলে তলে খোঁজ নিয়ে দেখবেন সে কোনও দিন কোনও ছুতোয় আমার ত্রিসীমানায় আসবে না। সিনেমা ছেড়ে দিয়েছি, এর পর থেকে নাচ শিখিয়ে খরচ চালাব।"

পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে যেতে যেতে বল্লাম—"আমার জিনিষপত্র, বই-খাতাগুলো নিয়ে যাবার জন্যে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ওপর থেকে মুকুলিকার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—"আপনার জন্যে আমার দরজা চিরদিন খোলা থাকবে।"

পাশের ঘর থেকে নিরুর অসুখ উপলক্ষ্যে সমবেত ঠানদিদির কথাবার্ত্তা কানে আসছে: "কত দিন থেকে তোকে শরীরের যত্ন নিতে বলা হচ্ছে; এবার অসুখটা যেন তেমন কিছু নয়—"

নিরু উত্তর দিলে: "এবারকার অসুখ কিছু নয় বলে মনে হচ্ছে? তা হলে আপনাদের ভালবাসাও কমে গেছে। চৌদ্দ দিন ভুগলাম, কাল ঝোল-পাঁউরুটি আজ ভাত খেয়েছি। সোনার বর্ণ কালি হয়ে যায়নি?"

"ও রকম সোনার বর্ণ কালি হয় না, ফ্যাকাসে হয়। তুই হাওয়া বদলাতে যা। অজয় বেচারীও খুব ভাবছে, কোথাও যায় না, ভাল করে খায় না, আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় কাল থেকে আমাদের আসবার দরকার হবে না, কিন্তু ভয় হচ্ছে সারতে না সারতেই তুই আবার সংসার নিয়ে পড়বি।"

"জানেন না বুঝি সংসার সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছি, শুধু শুধু বাছ-বিচারের জন্যে এতদিন খেটে খেটে মরেছি। ঠাকুরের সিংহাসন ছাতের ঘরে তুলে দিয়ে ওইখানেই আপনাদের জন্যে একটু ব্যবস্থা—"

খিল খিল হাসির শব্দের সঙ্গে শুনলাম: "যাক্, ঠাকুরের সঙ্গে আমাদেরও ছাতে-নির্বাসন দিয়েছিস্। কি ভাগ্যি যে রসাতলে পাঠাস্‌নি!"

নিরুকে ওষুধ-পথ্য খাইয়ে একবাক্যে নিরুর সুখ্যাতি করতে করতে সকলে নেমে গেলেন। পাশের ঘর নিস্তব্ধ, ঘরের আলো নীল, নিরু হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, কিম্বা ঘুমের চেষ্টা করছে।

ঘরের কোণে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছি। বিহারী বাবু বিকেল থেকে ছুটি নেন। কোথাও যেতে হলে মুরলী ড্রাইভারকে সঙ্গে নিতে হয়। মুরলীর উপস্থিতিতে ট্রামে চড়লে অশোভন দেখাবে। মুরলী কি বংশীর মুখে আমার পরাজয়ের কাহিনী শোনেনি! লোকটার ভাবলেশহীন মুখ,—কর্ত্তব্যে ত্রুটি পাওয়া গেলে ছাড়িয়ে দিয়ে বাঁচতাম।

গত মাসের এই তারিখ থেকে মুকুলিকার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। বেদনাবোধের তীব্রতা কমে গেছে, বোধ হয় মোহ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলাম।

শুচিবাই নিরুর মজ্জাগত অভ্যাস, এতদিনে সে আমার মনের মত হওয়ার সাধনা করছে। ঘড়িতে তিনটে বাজল, কতক্ষণে চোখে ঘুম আসবে! বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তা ছাড়া নানা চিন্তায় মাথা গরম।—আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত নিরুকে কোনও দিন বিনিদ্র রজনী যাপন করতে দেখিনি।

আকাশে মেঘ জমার জন্যে হঠাৎ গরম পড়ে গেছে, আবহাওয়ায় গুমোট ভাব। পায়ের তলায় পাট-করা লেপ, গায়ে একখানি মাত্র সাদা চাদর। ছাতে একটু বেড়িয়ে এলে সুফল পাওয়া সম্ভব।

নিরুকে নির্বিঘ্নে ঘুমতে দেওয়ার জন্যে ছেলেমেয়েদের খাট সাময়িকভাবে দোতলায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। শব্দ বাঁচিয়ে সাবধানে ওপরে উঠে গেলাম। সিঁড়ির ঘরে আলো জ্বলছে, দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে অন্ধকারের মধ্যে একটি বঙ্কিম আলোকরেখার সৃষ্টি করেছে। নিরুর আওয়াজ পেলাম, কান্নাভরা গলায় সে কি যেন ঠাকুরকে নিবেদন করছে। দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দেখলাম সে

সিংহাসনের দিকে জোড়হাত প্রসারিত করে উপুর হয়ে শুয়ে আছে। ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলাম।

ছেলেমেয়েদের গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঘরের মধ্যে একঘর রোদ। ফুলটির গলা শুনলাম: "আয়া, তুমি এখানে বসে ছেলে কাঁদাচ্ছ? রোজই এই সময় এইখানে থাক? রোজের কথা আলাদা দেখছ না সাহেবের অসুখ করেছে। দিদি বেশ চুপ করে বসে আছিস —বারণ করতে পারিস্ না? ভাগ্যি এসে পড়লাম!"

আমার খোকা ভালমানুষ মেয়ে, বুদ্ধিমতী দুষ্টু মেয়ে—দুটি মেয়েকেই মিষ্টি লাগছে, সাহেবের জন্যে তাদেরও ভাবনা! আমারই মঙ্গল-কামনায় নিরু অসুস্থ শরীরে ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়ে ছিল। নিরুকে যত্ন করতে হবে, ছেলে মেয়েদের প্রতি আরও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আজকের দিনটা যেমন তেমন করে কেটে যাক্, কাল থেকে আমি কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা—স্নেহময় স্বামী।

আলোর তেজ সহ্য করতে পারছি না, চাদরে মুখ অবধি ঢাকা। চোখ মেলে দেখলাম, বড়খোকা শঙ্কিতভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। সে সতর্ক পাহারা থেকে চুপি চুপি খসে পড়েছে! আমাকে চোখ মেলতে দেখে সে খুশি হয়ে বলে উঠল—"বাবা, তুমি মরে যাওনি ত মুখে চাদর ঢাকা দিয়েছ কেন? তা হলে কেন মালীর বাবা মুখে চাদর ঢাকা দিয়ে মরে রাম রাম করতে করতে স্বর্গে চলে গেল?"

আমি যে মরে যাইনি তার প্রমাণ দেবার জন্যে ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে পড়ে খোকাকে কোলে নিয়ে তর্‌তর্ করে নিচে নেমে এসে তাকে তার ভাই-বোনদের কাছে নামিয়ে দিয়ে নিরুর সন্ধানে ভাঁড়ারে উপস্থিত হলাম। খোকার কীর্ত্তি শুনে নিরু ভুরু কুঁচকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—

"সব সময় অলক্ষুণে কথা। ডাক ত ছেলেকে, একটা চড় খেয়ে যাক্। কালকেই বকুনি খেয়েছে, বলে কিনা—'বাবার মা-বাবা কেমন ছবি হয়ে গেছে, তোমার মা-বাবা কখন ছবি হবে?' একে মা'র শরীর খারাপ—"

"হাসির কথায় হাসতে পার না? ছেলেমানুষ—"

"বুঝি সবই কিন্তু ঐ সব পাকা-পাকা কথা শুনলে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি।"

"আমিও ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি, সারতে না সারতে সংসার নিয়ে পড়েছ? ঠানদিদের খবর দিয়ে দি!"

নিরুর হাতে কলাই-করা সানকির ওপর চাট্টি ময়দা, ময়দার ওপর কালজিরে, জোয়ান, নুন, ঘি, লঙ্কার গুঁড়ো। মিনতি-মাখা গলায় সে বল্লে—"তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমি শুধু ময়দা একটু ঠিক করে দিচ্ছি।"

"ময়দা ঠিক করবার কি দরকার বুঝতে পারছি না।"

"তা নইলে চলে কই? রোজই ত পড়ে থাকে, চেহারার দিকে দেখ দেখি।"

"কি হয়েছে? সোনার বর্ণ বুঝি কালি হয়ে গেছে?"

নিরু হেসে উঠল—"ও মা, কালকের কথা সব শোনা হয়েছে! সোনার বর্ণ কি কালি হয়? সোনার বর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে যায়।"

খোকাকে উপলক্ষ্য করে সকাল থেকেই আবহাওয়া অস্বাভাবিক হয়ে গেল। হালকা মনে স্নান-আহার সমাধা করে আফিস গেলাম। ঠাকুরদার মত রাশভারী ভাব নিয়ে, বাবার মত সহানুভূতির সঙ্গে কর্ম্মচারীদের কাজ পরীক্ষা করে বাড়ী ফিরে এলাম। আমাকে দেখে

নিরু ভাঁড়ার ঘর ডেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল—"মোহন সিং, জলদি দৌড়কে উপরমে যাও। সাহেব খাট্‌কে খুট্‌কে ঘাম্‌কে আয়া।"

সাহেবকে খেটেখুটে ঘেমে আসতে দেখে নিরু আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছে, নইলে বিদ্রূপের ভয়ে সে আমার সামনে কখনও 'হিন্দি বাত' বলে না।

এমন একটি হাস্যরসের তলায় কোথায় যেন একটু করুণরস, নইলে আমার চোখে জল এসে পড়ছে কেন!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে স্বরু হোল, আকাশে-বাতাসে বৃষ্টির পুর্ব্বাভাষ। নিরুর বড়দির মেয়ের শাড়ী-গহনা পছন্দ অপছন্দের জন্যে নিরুকে বড়দির বাড়ী যেতে হবে। একটু বাদানুবাদের পর স্থির হোল গরম কাপড় ঢাকা দিয়ে নিরু সেখানে যাবে।

একটু আগে চিঠি পেয়েছি। মুকুলিকার কাছে সেলিনা শুনেছে, আমি একটি উন্নত ধরণের সিনেমা কেম্পানী খুলতে ইচ্ছুক ছিলাম, এখনও যদি আমার সে ইচ্ছা থাকে সেলিনার সকল রকম সাহায্য পেতে পারি। বুঝলাম সে আমার সঙ্গে যোগ রাখতে চায়।

স্বপন একটি 'ফিল্ম কোম্পানী' খুলবে। স্বশ্রী মেয়ের জোগাড় করে দিতে অনুরোধ করে আমাকে ওয়ালটেয়ার থেকে চিঠি দিয়েছে। বুঝলাম ফিল্ম-জগতে আমার আনাগোনা তার অজানা নেই।

এই দুখানি চিঠি নিয়ে মুকুলিকার কাছে গেলে কেমন হয়? নির্লিপ্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করব আমার ঠিকানা সেলিনাকে কে দিয়েছে? বলব, অতঃপর স্বপন শীলের সঙ্গে মিস্ সেলিনার যেন সোজাসুজি চিঠিপত্র চলে। কিন্তু আমি গেলে মুকুলিকা তার দলের লোকজনদের

নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে। একটি ছোট চিরকূটে নিজের বক্তব্য লিখে চিঠি দুখানি ত আমি ডাকেও পাঠিয়ে দিতে পারি।

পাশের ঘরে রেডিও খোলা, কান দিতে শুনলাম কে যেন লাটসাহেবের মহিমা-কীর্ত্তন করছে, ভারতীয়দের শুভচিন্তায় বর্ত্তমান বড়লাটের চোখে ঘুম নেই। বক্তৃতার পর গ্রামোফোন রেকর্ডে অনুরোধের গানের পালা সুরু হোল। প্রথমেই সর্ব্বজনের অনুরোধে সর্বজনপ্রিয় 'অভিমান' চিত্রের একখানি গান—"এ জীবনে প্রিয়, তোমারি আমি আর কারো নয় কারো নয়!"

ভোলবার ইচ্ছা থাকলেই কি ভোলা যায়! গলার স্বরে সমস্ত সঙ্কল্প ভেসে গেল। মনের মধ্যে ছবি ফুটে উঠছে—খাটের ওপর পদ্মাসনে অমরনাথ, সামনের মাটিতে জোড়হস্ত, গলবস্ত্র, নতজানু মুকুলিকা, মুকুলিকা গান গেয়ে যাচ্ছে—

"এ জীবনে প্রিয়, তোমারি আমি
আর কারো নয় কারো নয়!
তোমারি তরে লভিব আমি মরণের পরিচয়।"

—ন্যাকা কথার কাঁদুনে সুরের সেই গান!

এই চিঠি দুখানি, তা ছাড়া গত মাসের পাওনা টাকা, তা ছাড়া মুকুলিকার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে অমরের ভণ্ডামির মুখোস খোলবার জন্যে আমি যাব। বাইরে ঝুরঝুরে বৃষ্টি, কালো বর্ষাতির সঙ্গে রবারের জুতো পরে নিঃশব্দে ওপরে উঠে যাব। অপরাধীদের হাতে হাতে ধরে ফেলে শান্তভাবে আমার আসবার কারণ বুঝিয়ে দিয়ে একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে চলে আসব। এতদিনে প্রতিশোধ নেবার সুবিধে পাওয়া গেল।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি সুরু হতেই বোধ হয় লোকজনরা দুর্যোগের সময়ে পাখীর মত যে যার নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, ট্রামের মধ্যে একলা আমি। বৃষ্টিতে আমার মনও বোধ হয় ভিজে উঠল, এক মাস পরে আবার মুকুলিকাকে দেখব। মুকুলিকার কাঁচা স্বভাব, সে নিজেকে চেনে না, এতদিনে নিজের ভুল, আমার মূল্য সবই বুঝতে পেরেছে। গিয়ে হয়ত দেখব সে আমার ব্যবহার-করা বালিশে মুখ রেখে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছে। আমারই জন্যে তার সেই গান, মনে করে গানখানিকে আর তত খারাপ লাগছে না।

মুকুলিকার বাড়ীর সদর দরজা ছাড়া আর সমস্ত ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ। খুড়-মাসীর বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ লোকের কাশি শুনতে পেলাম।

মুকুলিকার ঘরের দরজা সামান্য খোলা—কালকের রাত্রের আলোকরেখাটির মত অন্ধকার-ভেদ-করা একটি আলোকরেখা।

মুকুলিকার হাসি শুনতে পেলাম।

মনের মধ্যে আহত সাপের আক্রোশ নিয়ে দরজার সামনে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যের ঘটনাকে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করছি। মাঝখানের পাঁচবাতির ঝাড়টা প্রকট, তা ছাড়া আর কিছুই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। তিননরী কাচের মালা-দোলানো ঐ জবড়জং ঝাড়টা আমারই টাকায় কেনা। কেনবার সময় অপছন্দ বলায় মুকুলিকার মা আকারে ইঙ্গিতে যেন আমি দাম শুনে পিছিয়ে যাচ্ছি এই রকম একটা ভাব প্রকাশ করায় ঐ দৃষ্টিশূল জিনিষটা কিনতে বাধ্য হয়েছিলাম।

দু' আঙ্গুলে সন্তর্পণে দরজাটা সামান্য ঠেলতে মুকুলিকার আলতা-পরা পা, লালপাড় শাড়ীর প্রান্ত, অমরনাথের ঝক্‌ঝকে হাসি দেখতে পাওয়া গেল। মুকুলিকা খাটের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে—তার কপালে সিঁদুর টীপ, হাতে শাঁখা,—অভিনেত্রী আজ গৃহস্থঘরের সতীলক্ষ্মী সেজে বসেছেন। মুকুলিকা সরে যাওয়ায় খাটের ওপর অমরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—গায়ে খয়েরী র‍্যাপার, হলুদ রঙা শাড়ীকে লুঙ্গির মত করে পরা, মাথায় এলোমেলো ভিজে চুল।

তোয়ালে হাতে নিয়ে মুকুলিকা ফিরে এলো। সে কি নিজের হাতে অমরের চুল মুছিয়ে দিচ্ছে? ক্ষুধিত বাঘ যে রকম ভাবে পা টিপে টিপে শিকারের দিকে এগিয়ে যায়, ঠিক সেই রকম গতিতে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমাকে দেখে মুকুলিকা দু' হাতে মুখ ঢেকে সভয়ে দূরে সরে গেল। অমরনাথ হাসিমুখে কি যেন বলতে গেল, তার মুখের সপ্রতিভ ভাব অক্ষুণ্ণ।

তারপর কখন, কি ভাবে, কতটুকু সময়ের মধ্যে আমি বালিসের তলা থেকে ছুরিটা নিয়ে অমরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি সে আমি নিজেই জানি না। জ্ঞান হতে বুঝতে পারলাম মুকুলিকা আমার চুল ধরে টেনে আমাকে স'রিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। আমার আক্রমণের মধ্য থেকে অমরের প্রাণহীন দেহ মাটিতে খসে পড়ল।

মাটিতে রক্তের স্রোত! অমরনাথের বুকের ওপর মুকুলিকার নিশ্চল দেহ। মুকুলিকার খোঁপা খসে গেছে, সাপের মত কুণ্ডলী-করা খোঁপার মধ্য থেকে সোনার কাঁটার ধারাল প্রান্তগুলি চিক্ চিক্ করে নিষ্ঠুরভাবে হাসছে! কড় কড করে শিলাবৃষ্টি সুরু হয়ে গেল, খোলা দরজা দিয়ে শিলের টুকরো ঘরের মধ্যে ফুলের মত ছিটিয়ে পডছে। শিলের টুকরোর ছলছলে করুণ হাসি, আলোর গায়ে কাচের মালার চক্‌চকে বিদ্রূপের হাসি, ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হাসির আভাস।

বাতাসে হু হু কান্নার শব্দ। পশ্চিমে জানালার ওপর ঠক্ ঠক্ করে শিল পড়ছে, পূর্ব্বদিকের জানালা বেয়ে জলধারার অবিরাম গতি, সদর দরজায় আছড়ে পড়ার আওয়াজ, মুকুলিকার হৃদয়ভেদী বিলাপের অস্ফুট ধ্বনি।

মুকুলিকার চেতনা ফিরে এসেছে, সে অমরের বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছে, তার সুগোল শাঁখা-পরা হাতের মধ্যে অমরের রক্তশূন্য নীলাভ হাত। ফোঁপানির মধ্য অমরের উদ্দেশ্যে চাপা প্রিয় সম্ভাষণ শুনতে পাচ্ছি—মন ছাড়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অত্যধিক মাত্রায় সজাগ।

আমার মন ভাবনাচিন্তাবিহীন। বাইরের একজন দর্শকের মত

দুই চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছি। সামনের দৃশ্য স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের মত এর সঙ্গে আমার যোগ নেই, এখানে আমার করবার কিছু নেই; সব কিছুই যেন আমার আয়ত্তের বাইরে।

মুকুলিকার কান্নার বেগ প্রশমিত হয়ে আসছে। সে ধীরে ধীরে উঠে বসে নিজের চুল, কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমাকে দেখে সে অবাক হয়ে বলে উঠল—“এ কি! আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? পালিয়ে যাননি?”

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এর চেয়ে বড় আঘাত কেউ কাউকে দিতে পারেনি। আমি 'খুনী কাপুরুষ, প্রাণভয়ে পালানই আমার পক্ষে স্বাভাবিক, মুকুলিকা আমার কাছে সেই প্রত্যাশাই করে।

মুকুলিকা দু' হাতে আমাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে বল্লে—“শুনছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? আপনার কোনও ভয় নেই। দাঁড়ান, আগে নিচেটা ভালো করে পরীক্ষা করে আসি, তারপর আমি আপনাকে সাহায্য করছি।”

চেয়ারের ওপব জাঁকিয়ে বসে পকেট থেকে সিগারেটের টিন বার করলাম। বুঝলাম মুকুলিকা আমাকে প্রাণভিক্ষা দিতে চায়, আমাকে পালিয়ে যাবার সাহায্য করবার জন্যে সে নিচে গেছে। কিন্তু নরসিংহ-পুরের বিখ্যাত মিত্রকূল! পূর্ব্বপুরুষেরা অনেক দুষ্কার্য করেছেন, জোঁকের মত শোষণ করেছেন, দস্যুর মত কেড়ে নিয়েছেন, পারিবারিক ইতিহাস অত্যাচারের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে, কিন্তু লোকে জানে নরসিংহপুরের মিত্ররা কখনও নিচু হয়ে ডুব দেয়নি। সাহায্য-ভিক্ষা তাদের ধাতে সয় না।

একটু পরে মুকুলিকা ফিরে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বল্লে—

"সকলে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমচ্ছে, যদি কাউকে বেরুতে দেখেন গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন। কেউ যদি আপনাকে দেখতে পেয়ে যায়, ফিরে এসে জানিয়ে যাবেন, আমি সব ঠিক করে দোব।"

"আমি যে পালিয়ে যাবার জন্যে লালায়িত এ ধারনা তোমার কি করে হোলো বুঝতে পারছি না।"

"ও মা কি সর্ব্বনাশ! বুঝতে পারছেন না এতে কি রকম বিপদের আশঙ্কা।"

"পাগল হয়ে যাইনি, যা বলছি সজ্ঞানেই বলছি। প্রাণভয়ে যদি আমাকে কাতর মনে করে থাক তবে তোমার ধারণা তোমারই থাক, পুলিশ আসা অবধি এইখানেই বসে থাকব। তুমি বরং কাউকে দিয়ে খবরটা—"

"কি সব কথা বলছেন, যারা জীবন্মৃত তাদের কথা বাদ দিলে বেঁচে থাকবার ইচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। ছেলেমেয়েদের জন্যে বাঁচবার চেষ্টা করার মধ্যে নিন্দের কি আছে?"

মনের মধ্যে ছেলেমেয়েদের মুখ ভেসে উঠল। বল্লাম—"পালিয়ে লাভ কি? কোথায় বা পালান যায়? দেশদেশান্তরে ছুটে বেড়ানোর চেয়ে ফাঁসী যাওয়া সুখের।"

"পালিয়ে বেড়াবেন কেন? আপনার নিজের ঘরেই থাকবেন। কেউ আপনাকে সন্দেহ করতে পারবে না। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। অমরের মৃত্যুর জন্যে আপনি ত দায়ী নন, আপনি যন্ত্রের মত কাজ করেছেন। আপনাকে এ কাজ করতে বাধ্য করালো কে? আমি নয় কি? অমরকে অমঙ্গলের মধ্যে আমিই টেনে আনলুম, ফাঁসীর দড়ি আমারই

প্রাপ্য। চিঠি লিখে লিখে তাকে আমি অতিষ্ঠ করে তুলেছিলাম। আপনি এক মাস না এলে বোঝা যাবে আপনার মোহ কেটে গেছে, এই মনে করে এক মাস সময় চেয়েছিল, আমারই বা দোষ কি? মিলনের আশা কম জেনে আমি একটি দিনের জন্যে তাকে চেয়েছিলাম, মনে করেছিলাম একটি দিনের স্মৃতিকে সম্বল করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দোব।" বলতে বলতে সে ডুকরে কেঁদে উঠল—"অমর সেই মাত্র এসেছিল, তার সঙ্গে কোনও কথা হোলো না। চিঠিতে আমি লিখেছিলাম—'তোমাকে ছেড়ে থাকার চেয়ে তোমাকে মেরে ফেলে তোমার সঙ্গে সহমরণে যাওয়া সুখের।' সেই চিঠি তার বাক্সে আছে, তাই থেকে প্রমাণ হবে অমরকে আমিই মেরে ফেলেছি। আমার কাছে লেখা অমরের চিঠিপত্র থেকে প্রমাণ হবে সে কত বড় ছিল, তাই থেকে তার আত্মীয়-স্বজনরা সান্ত্বনা পাবে। শুধু দিদিকে কাকাবাবুকে সব কথা খুলে বলব, তাঁরা আমাকে মন্দ ভাবলে সহ্য হবে না। তাঁরা যথেষ্ট গভীর ভাবে বুঝতে পারেন।—"

"সবই বুঝতে পারছি মুকুলিকা, আমার যে মন বলে কিছু থাকতে পারে তার প্রমাণ হয়ত আমি দিতে পারিনি। আমার কৃত কার্যের জন্যে তোমাকে ফাঁসীকাঠে পাঠিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারবো কি?"

মুকুলিকা বিহ্বলদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর সস্নেহে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে কান্নাভেজা মিষ্টি গলায় বল্লে—"আমাকে, আমার সহানুভূতির জন্য অন্তর থেকে ক্ষমা করুন। হালকা-মন নিয়ে যাতে সহমরণে যেতে পারি তার জন্যে

সাহায্য চাইছি। আপনি বিপদমুক্ত না হলে আমি·কি করে তৃপ্তি পাব? চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।”

আমার হাত ধরে সে আমাকে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, পথ জনমানবশূন্য। রাস্তায় নেমে মনে হোলো এ হতে পারে না—এ রকম করে বাঁচবার অধিকার আমার নেই। ছেলেমেয়েদের মুখ মনে করে মনে মনে প্রার্থনা করলাম, আমার পাপ যেন আমার সঙ্গেই চলে যায়, শাস্তি যেন বাছাদের স্পর্শ না করে। আমার চোখের জল বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে গেল।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে মুকুলিকাকে দেখতে পেলাম, তাকে ছায়ামূর্ত্তির মত দেখাচ্ছে। সে সিঁড়ি মোছার কাজে ব্যস্ত। বুঝলাম তার এই কাজ আমার আগমন-চিহ্নকে মুছে ফেলবার জন্যে। যে ঠাণ্ডা মাথায় এতখানি বিবেচনা করে কাজ করছে তাকে বুঝিয়ে ফেরাবার চেষ্টা করা বৃথা। আবার রাস্তায় ফিরে এলাম।

নির্জন পথে একলা আমি। মাথার উপর অন্ধকার আকাশ—আমাকে ঘিরে ঝম্ ঝম্ জল-ধারা। জলের মধ্যে হাত মেলে ধরলাম—বৃষ্টির জলে কি আমার সব পাপ ধুয়ে গেল! আমাকে ঘিরে কে যেন চোখের জল ফেলছে! আমার কাছে বুঝি অনেক প্রত্যাশা ছিল। অন্ধকারের মধ্যে এমন একটা কিছু উপলব্ধি করলাম—যাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি!

আমার বৈজ্ঞানিক মন ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে রাজি নয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই নবলব্ধ জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা যায় না কি?

বিগলিত মনে যুক্তিকে ঠিকভাবে দাঁড় করাতে পারছি না, কিন্তু বিশ্বাস ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যুক্তি সার্ব্বজনীন।

আমার পরিপূর্ণতা খণ্ডিত বিকৃত আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, উপরে উঠে গেলেই তার আমার মধ্যে বিভেদ থাকবে না, মিলন আয়ত্তের বাইরে নয়।

মুকুলিকাকে মনে পড়ে যাওয়ায় ছায়ামূর্ত্তির উদ্দেশ্যে মনে মনে বল্লাম—'তোমার সঙ্গেই আমার পুরাতন জীর্ণ আমিত্বের অবসান হয়ে গেল।'

পোষাক কামরায় দাঁড়িয়ে এই সব পোষাক-পরিচ্ছদের কি ব্যবস্থা করা যায় সেই সম্বন্ধে নিরুর সঙ্গে পরামর্শ করছি।

অনাবশ্যক কতকগুলি বোঝা বাড়ানোর স্পৃহাকে মানসিক সংক্রামক ব্যাধির পর্য্যায়ে ফেলা যায়। আপাত-দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও এর গুরুত্ব কম নয়, এরি জন্যে পরস্পরের মধ্যে প্রাচীব গড়ে ওঠে, হিংসার বিষ ফেনায়, তাই থেকে যত রকম জটিলতার সৃষ্টি।

মানুষ প্রকৃতিদত্ত রঙিন, কোমল, বিচিত্র আবরণে সজ্জিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সুন্দর হবার স্বাভাবিক স্পৃহাকে ব্যবসায়ীরা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে, সেই কারণেই নিত্য নূতন ফ্যাসানের আমদানী। কাকে, কখন, কি রকম সাজে সুন্দর দেখাবে তার বিচার করা কঠিন। ছোটনাগপুরের দিগন্তপ্রসারী মাঠের মধ্যে গোধুলির আলোয় প্রকৃতির দুলাল-দুলালীদের ফুল, পাতা, পাখীর পালক, মোটা কাপড়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মানুষ কি চায়? স্নেহ-ভালবাসার আদান-প্রদান ইতর প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়—পূজা পাবার ক্ষুধা মানুষের বিশেষত্ব। সহজ সরল পথের সন্ধান পাওয়া ভাগ্যের কথা। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার ভুল পদ্ধতিতে মানুষ জমকালো পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করে, জগঝম্প বাজায়, আকাশভেদী অট্টালিকা তৈরী করে।

নিজে ফুটে ওঠা, অপরকে ফুটে ওঠবার সাহায্য করা মানুষের কর্ত্তব্য। সকলের মধ্যে সমস্ত রকম সম্ভাবনা সমান পরিমাণে বিদ্যমান।

খুনী বা সাধু হওয়া পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। মহার্ঘ বসনে সজ্জিত হয়ে চলাফেরা করি, প্রতিবেশী ঈর্ষান্বিত চোখে চেয়ে থাকে, তার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়—আমার ব্যবহার ফুটে ওঠবার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

আমার কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়েছি, নিজেকে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবো না। আমার অশন-বসন, চলাফেরা, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি তুচ্ছ ব্যাপার বড় আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। নূতন অভ্যাসকে আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য, সময়ে অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়।

যাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে জগতের মঙ্গলকামনায় সংঘবদ্ধ হ'য়েছেন, আমি তাঁদের দলভুক্ত হব, আমাকে পেয়ে দলের শক্তিবৃদ্ধি হবে।

নিরু বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে, শুনতে শুনতে তার চোখে জল ভরে এলো, বল্লে—"তোমার এত বড় সংকল্পে বাধা দোব না, কিন্তু মন বড় দুর্বল। জামাকাপড়গুলো নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, নন্দকাকাকে দিয়ে ওগুলোর ব্যবস্থা আমিই করে ফেলতে পারবো। নন্দকাকা শুনে খুব খুশি হবেন। তিনি বিলিতি পোশাকের ওপর ভীষণ চটা। তাঁর মতে স্বাধীন দেশের লোকেরা ইংরেজদের অনুকরণে কাপড় পরে তাদের শোভা পায়। আমরা যাদের বুটের তলায় রয়েছি—সকল রকমে তাদের নকল করতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করি,—পরাধীনতায় আমাদের আত্মসম্মানবোধ ততটাই কমে গেছে দেখে তিনি পাগলের মত হয়ে যান। একটা হাসির কথা এত দিন তোমাকে বলি বলি করেও বলতে পারিনি।

পাটভাঙা ধুতি-চাদর পরা থাকলে তোমাকে আমার কুটুম্ব বলে মনে মনে হয়, কিছুতেই নিজের লোক বলে মনে করতে পারি না। ছোট-বেলা থেকে বাপের বাড়ীতে মোটাসোটা কাপড়চোপড় দেখা অভ্যেস বলেই বোধ হয় এ রকম মনে হয়। আমার মনে হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদাসিদে কাপড়ে সকলকেই সব সময়ে ভালো দেখায়। মেয়েরা সাদাসিদের ওপরেই একটু রং-চং করে মানিয়ে গুছিয়ে সাজগোজ করবে। নন্দকাকা একটা চরকা কিনেছেন, বলেন—'যদি নিজে সুতো কেটে কাপড় পরি, অন্ততঃ একটা বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না।' কত দিন ধরে রাতদিন চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সুতোর বদলে দড়ি হচ্ছে। আমি এরি মধ্যে বেশ ভালো সুতো কাটতে শিখে গেছি।" একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নিরু বল্লে—"শোনো, তোমার গোটা সংসারটা যদি তোমার পিছু পিছু চলে—খুব কি অসুবিধা হবে?"

বল্লাম—"কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। এগিয়ে চলার পথে বাহুল্য থাকতেই পারে না, সংসার আপনা থেকেই হালকা ঝরঝরে হয়ে যাবে। এই পথে তোমাকে সঙ্গিনী পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।"

— শেষ —

